দ্বিতীয় বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
পৌষ ॥ ১৩৮০

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

Approved by the Directorate of Public Instructions, West Bengal as a Children's monthly magazine. Vide No. 109 (16) T. B. C. *Dated 15. 3. '73.*

কলরব সূচিপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
জানুয়ারী ১৯৭৪, পৌষ ১৩৮০

কলরব (কবিতা)
মনোজিৎ বসু ৫৯

চেনো কেউ (কবিতা)
দুর্গাদাস সরকার ৬০

এ কোন্ দেশ (কবিতা)
সুধীর কাব্যশ্রী ৬০

কূট-বাণিজ-জাতক (জাতকের গল্প)
বিমলেন্দু চক্রবর্তী ৬১

ভূত বাংলোয় একটি রাত (ভৌতিক গল্প)
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫

টেলিফোন (গল্প)
নির্মলেন্দু গৌতম ৭০

এক-কন্যাই চালাক (গল্প)
তমাল চট্টোপাধ্যায় ৭৪

রূপান্তর (ধারাবাহিক উপন্যাস)
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৭৭

হাবুল গাবুলের কীর্তি (চিত্রে কাহিনী)
রবিদাস সাহারায় ৮২

ওরা খুনী (গল্প)
সুভাষ ঘোষাল ৮৪

অবাক ভাড়াটে ৮৭

বিজ্ঞানের আজব কাহিনী (বিজ্ঞান কাহিনী)
সবজান্তা ৮৮

বিপ্লবের অগ্নিশিখা (ঐতিহাসিক কাহিনী)
হাসিরাশি দেবী ৯১

টান (গল্প)
অমিয়কুমার চক্রবর্তী ৯৬

টারজানের বিচিত্র কাহিনী (ধারাবাহিক)
পার্থ সারথি ৯৮

ভিখারী বিদায় (সত্য ঘটনা)
ডাঃ বি দে ১০১

আমার দেশ আমার গর্ব (নিবন্ধ)
শ্রীধর মুন্সী ১০৩

বুবুল ও পাখীরা (গল্প)
অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ ১০৭

ভারতীয় খেলার কাঠামো (খেলা-ধুলা)
মুকুল দত্ত ১০৯

নূতন ধাঁধা ১১২

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার কর্তৃক বি-৪, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।
মুদ্রাঙ্কন ৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।
শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

দাম : ১·০০ টাকা

সুপক্ক আঙুর ও মূল্যবান আয়ুর্বেদিক ও ওষধি থেকে প্রস্তুত
ছাত্র-ছাত্রাদের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির আদর্শ টনিক
অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশংসাধন্য
ব্রেনো-ভাইটেলো

* সুষম খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীন দেহে শক্তির সঞ্চার করে।
* স্নায়ুবিক দৌর্বল্য ও অবসাদ দূর করে দেহ প্রাণবন্ত ও মন প্রফুল্ল করে।
* সর্বোপরি পড়াশুনায় একাগ্রতা আনে এবং স্মৃতিশক্তি প্রখর করে তোলে।
* এতে কোন উত্তেজক পদার্থ নেই।

প্রস্তুতকারক :
ইণ্ডো মেডিক্যাল ওয়ার্কস
(ভারতীয় ভেষজ সংস্থা)

ডিস্ট্রিবিউটার্স :
দেব কেমিক্যাল কোং
৩।৪৭ বিবেকনগর,
কলিকাতা-৩২

শিশু-সাহিত্যে সেরা লেখক
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের নতুন বই

লালচাঁদের টাকা নিমচাঁদের লাঠি—১·৫০
[নবাব মীরজাফরের আমলে নবাবজাদা মীরণের অনাচার ও নিমে ডাকাতের দুঃসাহসিক প্রতিরোধের কহিনী।]

অরণ্য দেউল—২·০০
[সিপাহী যুদ্ধের আমলে সাঁওতাল অরণ্যচারীদের এক চাঞ্চল্যকর কাহিনী। তাঁতিয়া টোপির সহকর্মী কুমার সিংহ, মধু মল্লিক ও তান্ত্রিক ভৈরবীর নরবলির উদ্যোগ পর্বের রোমাঞ্চ।]

বেনগাজীর আখড়া—২·০০
[আরব সাগরে পর্তুগীজ জলদস্যুদের লুণ্ঠন ও অনাচারের বীভৎসতা। এক লাঞ্ছিত কিশোরের জীবন কথা]

মহাকালের পূজারী—৪·৫০
[নন্দ রাজার বিরুদ্ধে চাণক্যের বিদ্রোহ ও এক রাখাল বালকের মগধের সিংহাসন লাভের কাহিনী।]

কিশোর গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড—৪·০০
[নীল নায়ের মাঝি ও হে বীর প্রণাম করি-দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস একত্রে।]

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

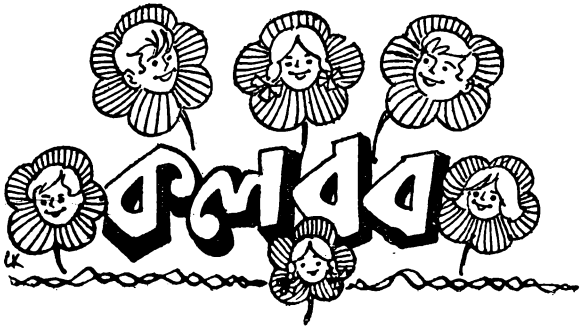

২য় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ✻ জানুয়ারী, ১৯৭৪ : পৌষ, ১৩৮০

কলরব

মনোজিৎ বসু

কলরব পথেঘাটে,
হাটে মাঠে কলরব।
কলরব বাড়ি ঘরে,
বাজারেতে কলরব।
কলরব কাছারিতে,
আপিসেও কলরব।
কলরব নেই কোথা?
সবখানে কলরব॥

কলরব কলেজেও,
ইস্কুলে কলরব।
কলরব ট্রামে-বাসে,
স্টেশনেও কলরব।
কলরব বিয়েতেও
শাদীতেও কলরব।
কলরব নেই কোথা?
সবখানে কলরব॥

কলরব মন্দিরে,
নদীতেও কলরব।
কলরব কাকেদের,
শেয়ালেরও কলরব।
কলরব ভালো নয়?
বিচ্ছিরি কলরব?
'কলরব' বই পেলে
করো কেন কলরব!!

চেনো কেউ ?

দুর্গাদাস সরকার

লোকটাকে চেনো কেউ ? ফুসফুস বাঁদরের,
তবুও সে শ্বাস নেয় আমাদেরি মতো।
মাথা ভরা পরচুলা তার ভারি আদরের,
দু'বেলা আয়না হাতে টেরি কাটে কতো!

লোকটার দুই পা-ই গিয়েছিল কাটা
রেলের চাকার তলে সেই কোন্ কালে।
বিলেতের সার্জেনী ভাগ্যেতে হাঁটা
হয়নি বন্ধ, তাই চলে তালে তালে।

লোকটি যে-চোখে দেখে তার কোনোটাই
যদিও নিজের নয়, ধার করা চোখে
চাল্‌সে পড়েনি আজো, তবু তার ঠাঁই
নিজের দু'চোখ নিয়ে যাবে কোন্ লোকে ?

লোকটির নেই শুনি অভাব কিছুই,
আসল নামেই তিনি ব্যবসা চালান।
এমন বুকের পাটা কা'র—তাকে ছুঁই ?
সুদের টাকায় তিনি সবই পালটান।

লোকটা কোথায় থাকে ?—বই-এর পাতায় ?
না, না, তিনি এই আমাদেরি মাঝে
নব কলেবর নিয়ে, যখন মাথায়
কাঁঠাল ভাঙেন তিনি,—তাঁকে চেনা যায়।

এ কোন্ দেশ

সুধীর কাব্যশ্রী

বকুল বলে ওই দেখো মা সবুজ মানুষ যায়
সবুজ পাখী কিচির মিচির কি সুখে গান গায়।
সবুজ হাঁসটি সাঁতার কাটে দীঘির সবুজ জলে,
সবুজ ফুলে সবুজ অলি কতই কথা বলে।
সবুজ মেঘের ডানা মেলে সবুজ আকাশ ওড়ে,
সবুজ কুঁড়ে ঘরটি তারে চায় ছুঁতে এই ভোরে।
সবুজ ধূলোকণার সাথে সবুজ আলো মেশে,
এলাম এ কোন্ দেশে মাগো এলাম
এ কোন্ দেশে!
মা বলে নিজ দেশেই আছো নয় এ নূতন ঠাঁই,
তোমার চোখে সবুজ চশ্‌মা সবুজ দেখ ছ তাই।

কুট-বাণিজ্য জাতক

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

ব্রহ্ম দত্ত তখন বারাণসীর রাজা। সেই রাজ্যে দু'জন বণিক ব্যবসা করে। একজন বণিকের নাম পণ্ডিত। অন্য জন অতি পণ্ডিত।

একদিন বণিক পণ্ডিত বলে—আয় ভাই, একসঙ্গে বাণিজ্য করি, সপ্তডিঙ্গা সাজাই। সমুদ্র পাড়ি দি। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ধন আনি, মাণিক্য আনি, সাত রাজার ধন এনে ঘরে তুলি। তারপর দু'জনে ভাগাভাগি করি। সোনার পালঙ্কে শুই, সোনার থালায় পঞ্চ ব্যঞ্জন খাই, মহা সুখে থাকি।

অতি পণ্ডিত এসব শুনে বলে—তাহ'লে বেশ হয়।

পণ্ডিত বণিক বলে—আয় ভাই, একসঙ্গে থাকি, একসঙ্গে বসি, একসঙ্গে বাণিজ্য করি।

অতি পণ্ডিত বলে—আচ্ছা ভাই। তবে—

তবে? তবে কি ভাই—

সমুদ্রে আমার বড় ভয়, একথা বলে অতি পণ্ডিত মাথা চুলকায়। মাথা চুলকায় আর বলে—সমুদ্রে জল আছে, বহর ডোবে। আকাশে মেঘ আছে, ঝড় হয়। জলে হাঙ্গর আছে, মানুষ ধরে খায়।

পণ্ডিত বলে—আচ্ছা বেশ। আমরা সমুদ্রে যাব না, সপ্তডিঙ্গার দরকার নেই। শকটে করে পথে পথে ঘুরে এখানের জিনিস ওখানে বেচবো। এ হাট থেকে ও হাটে বেচবো। এমনি করে সাত রাজার ধন আমাদের ঘরের মধ্যে আসবে।

আচ্ছা।

দু' বন্ধু একসঙ্গে বের হয়, গরুর গাড়ী চেপে। একখানা নয় অনেকগুলো। তারপর হাটের পথে যায়। হাটে গিয়ে বেছে বেছে জিনিস কিনে। জিনিস কিনে গরুর গাড়ীতে তোলে। কিনে আর গাড়ী ভরে। এমনি করে পুরো হাটটাই কিনে ফেলে।

তারপর রাস্তায়। রাস্তা দিয়ে খ্যাচ্ খোচ্! কি ব্যাপার? না, বণিকের পণ্য নিয়ে হাটে যায়। আগের গাড়ীর মাথায় পণ্ডিত। পেছনের গাড়ীর মাথায় অতি পণ্ডিত। পণ্ডিত আর অতি পণ্ডিত বণিক পণ্য নিয়ে আর এক হাটে যায়।

এমনি করে এক হাট থেকে অন্য হাটে। এমনি করে কেনা বেচা করে সাত রাজার ধন তাদের হাতের মুঠোয়। সাত রাজার ধন মুঠোয় পুরে পণ্ডিত বলে —আয় ভাই নিজের দেশে যাই।

অতি পণ্ডিত বলে—তাহলে ভালই হয়। ধনরত্ন তো আনা হ'ল—এবার আমাদের সুখের জীবন।

গরুর গাড়ী বাঁধছাদা হয়। বলদ জোড়া হয়। বস্তায় বস্তায় মোহর তোলা হয়। তারপর দু'বন্ধু দেশের পথ ধরে। নদী পাড় হয়ে, গাছের ছায়ায় যে রাস্তা তা পাড়ি দিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে আসে।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে, সঙ্গে সাত রাজার ধন। সবাই খুশী।

কিন্তু অতি পণ্ডিতের মুখে রুচি নেই, চোখে ঘুম নেই—বিছানা কণ্টক-শয্যা। গা কুট কুট করে। সাত রাজার ধন—এখনো ভাগ করা হয়নি। ভাগ করে ধন ঘরে এনে তবে চোখ বুজতে পারে।

সকাল হ'তেই অতি পণ্ডিত পণ্ডিতের বাড়ী যায়। তখন সূর্য সবে রাঙা মুখ করে পূব আকাশে মুখ দেখিয়েছেন। অতি পণ্ডিত পণ্ডিতের ঘুম ভাঙ্গায়। বলে—এস সাত রাজার ধন ভাগ করি।

পণ্ডিত বলে—বেশ তো।

অতি পণ্ডিত বলে—আমার দু' ভাগ, তোমার এক ভাগ। এরকম ভাগ কর।

পণ্ডিত তো শুনে আকাশ থেকে পড়ে। দু' ভাগ কেন নেবে অতি পণ্ডিত? দু'জনের টাকায় গরুর গাড়ী। দু'জনার টাকায় দু'জনার পায়ে হাটে-হাটে ঘুরে—তবে সাত রাজার ধন। সাত রাজার ধনে দু'জনার সমান ভাগ। অতি পণ্ডিত দু' ভাগ নেবে কেন?

অতি পণ্ডিত বলে—তা কি হয়। অতি পণ্ডিত আমি তাই দু' ভাগ আমার। শুধু পণ্ডিত তুমি—তুমি এক ভাগ নাও।

পণ্ডিত হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

আচ্ছা, এবার অতি পণ্ডিত বলে। দু' বন্ধুতে যদি ঝগড়া করি গাঁয়ের লোক হাসবে। হাটের লোক হাসবে—এসবে দরকার নেই। চল ভাই গাছের কাছে যাই। গাছ আমাদের ভাগ করে দেবে।

পণ্ডিত সহজ বুদ্ধিতে বলে—বেশ। তাই হোক। চল গাছের কাছে যাই।

তখন রাত দুপুর। আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার, গাছের ডালে পেঁচা দীপ জ্বালিয়েছে। শেয়াল গর্ত থেকে বের হয়ে রাস্তায়, জোনাকীর ঝাঁক বনে জঙ্গলে, তারা বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। তখন অতি পণ্ডিতের বুড়ো বাবাকে গাছের কাছে নিয়ে আসে। গাছের গায়ে বড় গর্ত, সেই গর্তে তাকে বসিয়ে রাখে।

অতি পণ্ডিত বুড়ো বাপকে সেই কোটরে বসিয়ে বলে—এইখানে থাক। যেমন বলেছি তেমন জবাব দিও।

অতি পণ্ডিত পণ্ডিতকে নিয়ে সেই গাছের তলায়, গাছের কাছে গিয়ে বলে—এই গাছটাকে জিজ্ঞাসা করি, কেমন ?

পণ্ডিত বলে—আচ্ছা।

অতি পণ্ডিত বলে—গাছ দেবতা, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই—

কি কথা, কি কথা ?—অমনি গাছ বলে ওঠে।

অতি পণ্ডিত বলে—সাত রাজার ধন এনেছি। বাণিজ্য করে পাওয়া। তাই সাত রাজার ধন ভাগ নিয়ে গণ্ডগোল।

কি গণ্ডগোল ?—আবার গাছ বলে ওঠে।

—আমি অতি পণ্ডিত দু' ভাগ চাই। ও পণ্ডিত ও এক ভাগ পাবে। এমনি যদি ভাগ হয় তবেই ভাগ ঠিক হয়।

—ঠিক, ঠিক। গাছ বলে ওঠে।

অতি পণ্ডিত বলে—এই তোমার বিচার ?

—ঠিক ঠিক, আবার গাছ বলে ওঠে। দু' ভাগ অতি পণ্ডিত এক ভাগ পণ্ডিত এই বিচার ঠিক। একথা বলে গাছের ভিতরে বসে আছে অতি পণ্ডিতের বাবা, সে চুপ করে যায়।

অতি পণ্ডিত তখন পণ্ডিতের মুখ দেখে। ভাবে, এবার পণ্ডিতের মুখে চুন—সাত রাজার ধনের দু' ভাগ আমার। মনের আনন্দে অতি পণ্ডিত বাড়ীর পথ ধরে।

পণ্ডিত ভাবে আর মাথা চুলকায়। গাছ কথা বলে। ভেবে ভেবে পণ্ডিত মাথা নাড়ে। মনে মনে বলে—গাছ আবার কথা কয়।

এ কথা ভেবে পণ্ডিত বিচালীর গাদা এনে ফোকরে ঢুকিয়ে আগুন লাগায়।

আগুন লাগিয়ে দিতেই প্রথমে ফুলকী। ধোঁয়ায় মাথায় তাদের নাচানাচি। একটু করে আগুন বিচালী বেয়ে বেয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে গাছের মাথায়। এমনি করে আগুন অতি পণ্ডিতের বাবাকে ধরে ফেলে।

গেলাম, মোলাম। অতি পণ্ডিতের বাবা আগুনে ঝলসায়, আগুনে পোড়ে, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে যায়। কোনরকমে ফোকর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। লাফ দিয়ে পড়ে পণ্ডিতের সামনে।

অতি পণ্ডিতের বাবা আগুনের তাপে ঝলসে যাওয়া দেহ নিয়ে কপাল চাপড়ায়। মূর্খ ছেলের নাম অতি পণ্ডিত রাখার জন্য অনুতাপ করে। নিজের ভুল বুঝতে পারে।

তারপর পণ্ডিতকে সসম্মানে বাড়ীতে নিয়ে এসে নিজেই সমান ভাগে ভাগ করে দেয়। সাত রাজার ধন দু' ভাগ হয়। দু' ভাগ তখন দু'জনে নেয়।

সরকারী কাজে প্রায়ই আমাকে ছুটে বেড়াতে হয়। তাই কখন কোথায় যে আমায় ট্রেনে চেপে বসতে হবে ওপরওয়ালার হুকুমে তার কোনও ঠিক নেই। প্রতিযোগী খেলোয়াড়ের মত সর্বদা 'ষ্টেডি' হয়ে থাকতে হয়। শুধু 'গো' বলার অপেক্ষা।

সেই 'গো' বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আজ বম্বে মেলে চেপে ছুটে চলেছি চক্রধরপুরে।

অনেক ষ্টেশন পেরিয়ে পেরিয়ে ওখানে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম তখন রাত দুটো।

একটা জংশন ষ্টেশন চক্রধরপুর। কিন্তু যাত্রী নামলো মাত্র দু'চার জন। আবার তারা যে কে কোথায় কখন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। একে অচেনা অজানা জায়গা, তার ওপর হাড়-কাঁপানো শীতের রাত। সবেমাত্র একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। হিমেল হাওয়া বইছে শাঁ-শাঁ করে।

ঠক্‌ঠক্ করে বলির পাঁঠার মত শীতে কাঁপছি আমি। ঠাণ্ডায় হাত পা জমে হিম হয়ে আসছে। দাঁতে দাঁত ঠক্‌ঠক্ করে বাজছে।

খাঁ-খাঁ করছে ষ্টেশন। জনমানবের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না কাছাকাছি। ষ্টেশনের আলোগুলো জমাট অন্ধকার গায়ে মেখে যেন ঝিমুচ্ছে ঘুমের ঘোরে।

ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। ঠেলাঠেলি করে কারও সাড়া পেলাম না।

বোম্বে মেলকে ছেড়ে দিয়ে সবাই কি যে-যার আস্তানায় কেটে পড়লো! জংশন ষ্টেশনের এমন অবস্থা ত হবার কথা নয়!

টর্চটা বার করে জ্বাললাম। দেখলাম ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমের সামনে একটা

বেঞ্চ পাতা। আর ঠিক তারই নীচে একপাশে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে কে যেন কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

কাছে গিয়ে ডাকলাম তাকে। কোনও সাড়া নেই। আবার ডাকলাম। নড়ে-চড়ে উঠলো ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা পুঁটলিটা। গায়ে হাত দিয়ে আস্তে ধাক্কা দিলাম। লোকটা ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলো।

চম্‌কে উঠলাম আমি। টর্চের আলোয় আমার সামনে জ্বলে উঠলো আগুনের ভাঁটার মত ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়া দুটো লাল চোখ। কি ভয়ঙ্কর বিশ্রী মুখ লোকটার। সারা মুখটা পোড়া ঘায়ে দগ্‌দগ্‌ করছে। একদিকে একদম মাংস নেই। মুখের হাড় চোয়াল সমেত লম্বা লম্বা দাঁতগুলো তার কি কুৎসিতভাবে বেরিয়ে আছে! একটা পচা দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল আমার।

ভয়ে শিউরে উঠলাম ঐ বীভৎস মূর্তি দেখে। হাতের টর্চটা মাটিতে পড়ে গেল।

লোকটা আমার দিকে ড্যাব্‌ড্যাব্‌ করে চেয়ে আছে। কি ভয়াল দৃষ্টি তার!

একটা গোঙানি শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

বুকে সাহস পেলাম কিছুটা। কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলাম—হ্যাঁ ভাই, এখানে থাকবার কোনও জায়গা নেই?

গোঁ—গোঁ—আওয়াজ করে কি বললো লোকটা। একবর্ণও তার বুঝতে পারলাম না।

ছেঁড়া কাপড়চোপড় মুড়ি দিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়াল।

একি, ওর একটা পা নেই!

আমাকে ইসারা করেই ক্রাচের খট্‌খট্‌ আওয়াজ করে একটা বিশ্রী গোঙানি শব্দ করতে করতে সে এগিয়ে চললো ষ্টেশনের বাইরে।

আমি ওকে স্বপ্নাবিষ্টের মত অনুসরণ করতে লাগলাম।

আবার ঝির ঝিরে বৃষ্টি আরম্ভ হল। তার সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। জমে বরফ হয়ে যাবার সামিল!

পথের দু'ধারে ঘন বন। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা নিশুত নিঝুম রাত।

ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না ঝরে পড়ছে আশপাশের ঝোপঝাড়ে। ঝরে-পড়া ভিজে পাতায় কারা যেন চুপিসাড়ে খস্‌খস্‌ শব্দ করে চলে বেড়াচ্ছে।

একটা প্যাঁচা বিশ্রীভাবে ডেকে উঠলো। তার পাখার ঝাপটায় রাত্রির নীরবতা খান্‌খান্ হয়ে গেল।

ভয়ে আমার গা'টা ছমছম করছে।

লোকটা নির্বিকারভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রাচের ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ ভয় ছড়াচ্ছে চারিদিকে।

আমিও সেই প্রেতমূর্তিটাকে অনুসরণ করে চলেছি গভীর রাতে নিশি ডাকে ভোলা মানুষের মত।

ঘেউ—উ-উ। একটা কুকুর কেঁদে উঠলো কোথায় কোনখানে কে জানে।

আমার বুকের পাঁজরে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। সারা শরীরের শিরা উপশিরার রক্ত চলাচল বুঝি বন্ধ হয়ে আসছে।

তবুও আমি চলেছি।

কিছুক্ষণ পরেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে এসে ও থমকে দাঁড়ালো। এক হাত দিয়ে বিরাট লোহার গেটটা খুলে ভিতরে ঢুকলো। আমিও ঢুকে পড়লাম ওর পিছু পিছু।

বিরাট বাড়ীটা অন্ধকার গায়ে মেখে যেন প্রেতপুরীর মত দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে।

ক্যাঁ-এ্যাঁ-চ্—ওর হাতের ঠেলা পেয়ে ঘরের দরজাটা খুলে গেল।

রাত্রির মত একটা আশ্রয় পেয়ে বাঁচলাম আমি।

বৃষ্টিতে জামাপ্যাণ্ট সব ভিজে গেছে। তাই ওগুলো পাল্টে নিয়ে বসলাম একটা লোহার খাটের ওপর।

টর্চের ক্ষীণ আলোয় যতদূর সম্ভব বসে বসে সারা ঘরটাকে দেখতে লাগলাম।

প্রকাণ্ড একটা বিরাট হল ঘর। জরাজীর্ণ অবস্থা। হাওয়ায় জানলা দরজার পাল্লাগুলো আছাড় খাচ্ছে। ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে বালিচুন। ওপরে ছাদের কড়ি বরগাগুলো ঝুলে আছে। মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি আমার বুকের ওপর খসে পড়বে।

বিশ্রী ভ্যাপ্‌সা গন্ধ ছড়িয়ে আছে সারাটা ঘরে। ঝাঁকঝাঁক চাম্‌চিকে পত্‌পত করে উড়ছে। আমার মুখে মাথায় ওদের পাখার ঝাপ্‌টা।

কিন্তু কোথায় গেল সেই লোকটা!

ঘরে আলো নেই। একটা টেবিল ল্যাম্প পড়ে আছে দেখলাম। কিন্তু কাচ নেই। পকেট থেকে দেশলাই বার করে তার পল্‌তেগুলোয় আগুন লাগালাম। তেল না থাকায় একটু পরেই ঝড়ের ধমক খেয়ে নিভে গেল।

আমি পাথরের মত বসে আছি খাটের ওপর শক্ত মুঠোয় টর্চটা ধরে। তার ক্ষীণ আলোর রেখা ঝরে পড়ছে।

পেটের জ্বালা আমি ভুলে গেছি। পিপাসায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

ঘরের কোণে দেখলাম একটা কুঁজো। নেড়ে দেখলাম তলায় একটু জল আছে। কুঁজোটা তুলে তার জলটুকু গলায় ঢেলে দিলাম।

কিন্তু একি—কি খেলাম আমি! সারা গা-টা আমার ঘুলিয়ে উঠলো। মনে হ'ল যেন এক গ্লাস কেঁচোর মত সরু সরু পোকা আমার গলা দিয়ে কিল্‌বিল্ করতে করতে পেটে নেমে গেল।

মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এসে খাটে শুয়ে পড়লাম।

খট্-খট্-খট্। আবার সেই ক্রাচের আওয়াজ, চমকে চেয়ে দেখলাম।

একি—ঘরে ও কে ঢুকলো! অদ্ভুত লম্বা ছায়ামূর্তি একটা—যেন রণপায় ভর দিয়ে ঘরের ছাদে মাথা ঠেকিয়ে কালো চাদরে সারা শরীর ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

কান্নার মত নাকী সুরে কি যেন বললো।

তারপর বাঁশের মত লম্বা হাত দিয়ে টেবিলের ওপর কি যেন একটা ধপাস্ করে ছুঁড়ে রাখলো।

টর্চটা ওর দিকে তুলে ধরলাম কোনরকমে। নিমেষের মধ্যে ছায়ামূর্তিটা কালো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভয়ে কাঁপছে আমার সারা শরীর। হাত থেকে টর্চটা গড়িয়ে পড়ে গেল। তার নিভু নিভু আলোর ম্লান রেখা মেঝের ওপর পড়ে রইল মুখ থুবড়ে।

মুখে হাত চেপে শুয়ে রইলাম আমি।

এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। একটু সামলে নিয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ খুললাম।

ওকি! কাদের অতগুলো মোম ঘরের চারিদিকে জ্বলছে। একটা নয়—দুটো নয়—দশটা বিশটা নয়। অসংখ্য রাঙা চোখ মেলে কারা যেন আমায় গিল্‌তে আসছে!

কঁ্যা-কঁ্যা-কঁ্যা—বিশ্রী চীৎকারে আর পাখার ঝাপ্‌টায় ভরে গেল ঘরটা। একটা ভয়ঙ্কর অজগর প্যাঁচার মত একটা পাখীকে গিলে আসে ঠিক আমার মাথার কাছে। পাখীটাকে পেটে পুরে সাপটা এবার আমার দিকে তেড়ে আসছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি লক্‌লক্ করছে ওর সরু জিবটা। নতুন শিকারের সন্ধান পেয়ে আনন্দে ফুলে ফুলে উঠছে ওর মোটা লম্বা শরীরটা।

চীৎকার করে উঠলাম। প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে আছড়ে পড়লাম মেঝের ওপর।

ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখলাম স্টেশনের ওয়েটিং রুমের সামনে বেঞ্চের ওপর আমি শুয়ে আছি।

রোদে ঝলমল করছে চারদিক। ব্যস্ত লোকের ভীড়ে জমজমাট হয়ে উঠেছে জংশন স্টেশন।

জামা প্যান্ট সব ঘামে ভিজে সপসপ করছে। চোখ রগড়ে আশপাশে ভাল করে তাকালাম।

দেখলাম গতরাতে ট্রেনে কাটা পড়া বিকৃত সেই লোকটাকে বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুটো ধাঙড়।

টেলিফোন

নির্মলেন্দু গৌতম

প্রভাসবাবুর টেবিলের ওপর টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে চক্ চক্ করতে থাকলো মিহিরের চোখ। আর ফুট দেড়েক ডানদিকে সরিয়ে রাখলেই ফোনটা মিহিরের ঘরের টেবিলে থাকতে পারে। মনে মনে মিহির ভাবলো।

সত্যিই তাই। তাদের দু'জনের বাড়ির বাইরের ঘর দুটো একটা দেয়াল দিয়ে আলাদা করা। আগে একটা ঘরই ছিলো। ভাড়া দেবার সুবিধের জন্য এখন দুটো ঘর করা হয়েছে।

দুটো ঘরের ভেতরে এই দেয়ালটা বেশী হলে আধফুট চওড়া। ঠিক তার গা ঘেঁসেই ওদিকের ঘরে মিহিরের টেবিল। সুতরাং দেড় ফুট ডানদিকে সরিয়ে রাখলেই।—

নাঃ, এসব যখন হবার নয়, তখন আর মিহির এ নিয়ে ভাববে না। মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললো মিহির।

'কি হলো, টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন?' হঠাৎ শুধালেন প্রভাসবাবু।

'না মানে, আপনি ভাগ্যবান লোক, তাই ভাবছিলাম।'

টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে 'ভাগ্যবান' বলায় প্রভাসবাবু বোধহয় অবাক হলেন। বললেন, 'ভাগ্যবান মানে?'

'মানে, একই বাড়িতে বলতে গেলে আমরা থাকি। একটা আধফুট মাত্র পার্টিশন আমাদের দু'জনের ঘরের মাঝখানে। অথচ আমার বাড়িতে টেলিফোন নেই, আপনার বাড়িতে আছে।'

প্রভাসবাবু একটু হাসলেন। বললেন, 'ও! তা এতে আর ভাগ্যের কি আছে। আর ধরুন, তাহলে অজস্র লোককেই তো ভাগ্যবান বলতে হয়।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনার দরকার হলে এই টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু।'

মিহির রীতিমতো খুশী হয়ে উঠলো। বললো, 'তাহলে তো ভারি সুবিধে হয় আমার। টেলিফোন এলে এখান থেকে ডাকলেই আমি শুনতে পাবো। শুধু একটু কষ্ট ক'রে ডেকে দেবেন এই আর কি!'

'এতে আর কষ্টের কি আছে? দরকার না হ'লে কি আর কেউ খরচ ক'রে টেলিফোন করে! সুতরাং ডেকে দেওয়াটা আমার একেবারেই কষ্ট ব'লে ভাবা উচিত নয়।'

মিহির মুগ্ধ গলায় শুধু বললো, 'আপনার মতো লোক পাওয়া সত্যিই রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার প্রভাসবাবু। টেলিফোনের জন্য আপনি ভাগ্যবান; আর আমি ভাগ্যবান আপনার মতো লোক পেয়ে।'

প্রভাসবাবু কিছু না ব'লে শুধু হাসলেন।

সেদিন থেকেই চেনাজানা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন, সব্বাইকে টেলিফোন নম্বর দিয়ে দিলো মিহির। বললো, 'ভারি ভালো লোক প্রভাসবাবু। টেলিফোন তুলে কেবল আমায় চাইলেই হবে।'

আর তার পরদিন থেকেই মিহিরকে চাইতে শুরু করলো সবাই।

আধঘণ্টা পরপরই আসতে থাকলো সে-সব টেলিফোন।

কারোই বলতে গেলে কোনো কথা নেই। টেলিফোনের জন্যেই টেলিফোন।

'কীহে কি করছো?'

'হাতে কাজ নেই ভাবলাম তোকে ফোন করি! আর বলিস না, বারোয়ারী ফোন পেলাম, ডাকলাম তোকে', 'আজ বিকেলে একবার আসিস, মিহির, ছোটপিসি আসছে।' ইত্যাদি কথাই ফোনের ভেতর দিয়ে রীতিমতো রোমাঞ্চিত করতে থাকলো মিহিরকে।

'আপনার তো চেনা লোকের সংখ্যা কম নয়!' প্রভাসবাবু বলেন শেষ পর্যন্ত।

মিহির নিতান্ত অবহেলায় বলে, 'এ আর কি! দশ মিনিটে একটা করে ফোন আসতে পারে। আসবেও। সবাই এখনও জেনে যায় নি। ক'টা দিন যেতে দিন।'

প্রভাসবাবু কিন্তু তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেন না এসব কথায়। শুধু বলেন, 'আপনি মশাই সত্যিই ভাগ্যবান লোক।'

দশ মিনিট পর পর ফোনের জন্য মিহির ফোন নম্বরসহ একটা কার্ড ছেপে ফেললো। তারপর দু'দিনের ছুটি নিয়ে সেই কার্ড বিলিয়ে দিতে থাকলো অকাতরে। দু'চারজন অচেনা লোকও পেয়ে গেলো সে কার্ড। বলতে গেলে চেনা অচেনা নিয়ে ভাবলোও না মিহির। ভাববার সময়ও পেলো না।

ঠিক দিন চারেক পর থেকেই দশ মিনিট পর পর ফোন। অচেনা দু'চারজনের ফোনও আসতে থাকলো।

প্রভাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সগর্বে মিহির বললো, 'কি বলেছিলাম না, দশ মিনিট পর পর ফোন আসবে?'

'তা বলেছিলেন বটে।' শুকনো মুখে বললেন প্রভাসবাবু।

'দেখবেন, এবার এক মিনিট পর পরই আমায় ডাকতে হবে।'

কথাটা শুনে প্রভাসবাবু যেন কি ভাবতে থাকলেন। মিহির অবশ্য তা নিয়ে কিছু ভাবলো না। অন্যের ভাবনা নিয়ে মিহির ভাবতে ভালেবাসে না। মিনিটে মিনিটে টেলিফোনের কথাটাই ভাবতে থাকলো। সেটা ভাবতেই তার ভালো লাগছে আপাততঃ।

পরদিন ভোরবেলায় মিহির হঠাৎ ট্যাক্সির শব্দে বাইরে এসেই ছাখে, প্রভাস বাবুর দরজার সামনে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে।

কী ব্যাপার? এখন প্রভানবাবুর বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে কেন? ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মিহির।

প্রভাসবাবু স্যুটকেশ নিয়ে বাইরে এলেন। সঙ্গে বাড়ির সবাই। প্রভাসবাবু তালাবন্ধ করলেন দরজাটা।

'কোথায় যাচ্ছেন?' মিহির অবাক হয়ে বললো।

'এই তো, মাস খানেকের ছুটি নিয়েছি। বেড়িয়ে আসবো। রাঁচী থেকে ফাঁড়া কাটিয়ে আসবো আর কি!'

ফাঁড়া কাটিয়ে আসবেন মানে? কিসের ফাঁড়া?' দারুণ অবাক হয়ে বললো মিহির।

কিছু একটা ভাবলেন প্রভাসবাবু। তারপর বললেন, 'সে এসে বলবো।—'

বলে অসম্ভব ভয়ে একটুখানি হাসলেন প্রভাসবাবু। এবং অবাক-হওয়া

মিহিরের কিছু করার আগেই ট্যাক্সিতে উঠে পড়লেন। মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলো ট্যাক্সি।

কিসের ফাঁড়া আছে প্রভাসবাবুর? রাঁচীতে তো মাথা খারাপ হ'লে যেতে হয়। চেনাজানা কতজনই গেছে রাঁচীতে। তারা সব্বাই বদ্ধ পাগল। ফাঁড়াটাড়া কাটাতে কেউ রাঁচী গেছে, এমন কথা জীবনে শোনেনি মিহির।

তাহলে কি পাগল হবার ফাঁড়া?

কিন্তু প্রভাসবাবুর মতো সুস্থ একটা মানুষ পাগল হবেই বা কেন? কখনও মুহূর্তের জন্যও তার মধ্যে পাগলামীর লক্ষণ দেখেনি মিহির। যাবার সময়ও দিব্যি সুস্থ লোকের মতো চলে গেলেন প্রভাসবাবু।

তাহলে প্রভাসবাবুর কিসের ফাঁড়া? ওসব থাকলে বরং ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকে সবাই।

কথাটাকে গুছিয়ে ভালো ক'রে ভেবে উঠবার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠলো দেয়ালের ওদিকে।

নিশ্চয়ই তার টেলিফোন। মিহির বুঝতে পারলো। আজ খুব ঘন ঘন টেলিফোন আসবে।

কথাটা ভাবতেই মিহিরের কাছে প্রভাসবাবুর ফাঁড়া কাটিয়ে আসবার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেলো।

সত্যিই প্রভাসবাবুর একটা ফাঁড়া আছে। নিজের কাছেই এমনি ঘন ঘন টেলিফোন এলে সেই ফাঁড়াটার কথা ভাবতে হয়। একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে যাবার ফাঁড়া। অন্যের টেলিফোন হ'লে তো কথাই নেই। রাঁচীতে গিয়ে সেটা কাটিয়ে আসতেই হয়।

টেলিফোনটা থেমে গিয়ে আবার বাজতে শুরু করেছে। নির্ঘাৎ দ্বিতীয় ফোন তার নামে। কী করা যায় ভেবেই ছুটে ঘরে এলো মিহির।

ঘরে এসে অসম্ভব তাড়াতাড়ি স্যুটকেশ গোছাতে থাকলো। এক মাস তাকেও বেড়াতে বেরুতে হবে। নাহলে যারা টেলিফোন করছে তাদের কি বলবো?

তার টেলিফোন মানেই যে প্রভাসবাবুর ফাঁড়া, আর প্রভাসবাবুর ফাঁড়া মানে যে তার নিজেরই পালিয়ে বেড়ানো, তা যদি আগে জানতো মিহির!!

———

এক কন্যাই চালাক

তমাল চট্টোপাধ্যায়

এক যে রাজা। তাঁর একটিই ছেলে। সে বড় হ'য়েছে। এখন তার বিয়ে হবে। এই শুনে নানান দেশের রাজকন্যেরা রাজবধূ হবার জন্যে আগ্রহী হ'য়ে উঠলো। কিন্তু হ'লে কি হবে! যুবরাজ তাদের কাউকেই পছন্দ করলো না। কারণ? কারণ এই যে, যুবরাজ শুধু রূপে গুণে অনন্যা কোন রাজকন্যাকে বিয়ে করবে না। তার প্রতিজ্ঞা, এমন কন্যে চাই যার রূপ থাক না থাক খুব চালাক চতুর হবে। কেননা যুবরাজ নিজে খুব চালাক। এবং সব সময় হেঁয়ালী আর ধাঁধায় কথা বলে। সেই সব হেঁয়ালির আসল মানে বোঝার মত ক্ষুরধার বুদ্ধি যার আছে শুধু সেই মেয়েই রাজপুত্রবধূ হবে। ফলে সব রাজকন্যেরাই একে একে বিফল হ'য়ে মনের দুঃখে ফিরে গেল।

একদিন যুবরাজ, কেমন যেন হতাশ হ'য়ে, ঘুর'ছিল বাগানের ভেতর আর নিজের মনে বিড় বিড় করে বলছিল, ওহ্ সত্যি যদি একটা চালাক মেয়ে পেতাম তবে সুখী হ'তে পারতাম জীবনে। ঠিক সেই সময় একটা গরীব কাঠুরে কাঠের বোঝা মাথায় করে ওই বাগানের পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। কথাটা তার কানে গেল। সে ভাবলো, তাই তো, তার তো একটা মেয়ে আছে। আর সে মেয়ে দারুণ চালাক। এমন সব হেঁয়ালিতে কথা বলে যে কাঠুরে তার একবর্ণও বুঝতে পারে না। তাছাড়া দেখতেও এমন সুন্দরী যে কেউ তাকে কাঠুরের মেয়ে বলবে না। তাই সে মাথার বোঝাটা নামিয়ে সাহসের ভরে রাজপুত্রকে বললে, আমার একটা খুব সুন্দরী আর দারুণ চালাক মেয়ে আছে। যদি অপরাধ না নেন তবে বলি, আপনি যেমন একটি মেয়ে খুঁজছেন, আশা করি, আমার মেয়ে পুরোপুরি তাই। চমকে উঠে রাজপুত্র কাঠুরের দিকে তাকিয়ে বললো, কাঠুরের মেয়ে? তারপর খানিকটা কি ভেবে হেসে বললে, বুড়ো, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি যখন রাজকন্যেদের ভেতর সত্যিকারের কোন চালাক মেয়ে পেলাম না তখন সাধারণ ঘরের মেয়েদের মধ্যে থেকে সেই রকমটি একজনকে খুঁজে বের করতেই হবে। তারপর কাঠুরের ঠিকানা নিয়ে বললে, বেশ, তাহ'লে আমি তোমার মেয়েকে একটা চিঠি লিখে চাকর দিয়ে পাঠাচ্ছি। তোমার মেয়ে যদি তার অর্থ বুঝে সঠিক জবাব পাঠাতে পারে তবে বুঝবো সে প্রকৃতই চালাক এবং পাত্রী হিসেবে আমার যোগ্য। কাঠুরে তো মহানন্দে তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে

তার মেয়েকে সব কথা খুলে বললো। শুনে কিন্তু কাঠুরের মেয়ে মোটেই বিচলিত হ'ল না। বরং বললে, বেশতো ভালই ; আমার বিশ্বাস আমি ঠিক জবাব দিয়েই যুবরাজকে খুশী করতে পারবো।

তারপর সত্যিই একদিন রাজপুত্র ঘোর কৃষ্ণকায় এক চাকর কাঠুরের বাড়ী পাঠালো, যার হাতে কয়েকটা জিনিস আর কঠিন হেঁয়ালী ভরা একটা ছোট্ট চিঠি। সে চিঠিতে লেখা ছিল :

বারো মাসে একটি বছর
এটা সবাই জানে
শুক্লা তিথির পূর্ণ চন্দ্র
কি মায়াতে টানে!
অজ দেহের অংশ নিয়ে
জড়ানো আছে যেটি
আকণ্ঠ তার পূর্ণ বলেই
যত্নে খুলো সেটি।

চাকরটা কাঠুরের মেয়েকে দিয়ে দিলো সব। কাঠুরের মেয়ে তো খুব চালাক! তাই সে জিনিসগুলো ভাল করে দেখে তারপর চিঠিটা পড়ল। আর পড়েই হেঁয়ালীটা যে কি তা বুঝতে দেরী হ'ল না। তখন সে জবাবে একটা চিঠি লিখলো রাজপুত্রকে। তাতে সে লিখলো :

শুনলে কথা যে কেউ হাসে,
বছর এখন এগারো মাসে।
সব দিনই চাঁদ পূর্ণ নয়,
মাঝে মাঝেই আধেক হয়।
চর্ম পাত্র দেখতে পাই,
অন্তরে তার কিছুই নাই।

তারপর চাকরের হাতে চিঠিটা দিয়ে বললে, হ্যাঁ, একটা কথা, যুবরাজ আমার চিঠিটা পড়ে তোমার ওপর খুব রেগে যেতে পারে। এমন কি তোমায় মারতেও পারেন। সে সময় অবশ্য তোমাকে পথও আমি করে দিচ্ছি। এই বলে আর একটা ছোট্ট চিঠিও মেয়েটি লিখে সেই চাকরের হাতে দিল। সে চিঠিতে লেখা হ'ল :

সেই যে পাখী দুধের বরণ
চাইছো যাকে করতে হরণ
তার তরে কি হওয়া উচিত
দুষ্টু কালো কাকের মরণ !

'বেশ ঠিক আছে', বলে যুবরাজের চাকর চিঠি দু'টো নিয়ে ফিরে গেল। রাজপুত্র অধীর আগ্রহে বসেছিল। চাকরটা প্রথম চিঠিটা হাতে দিল তার। খুব মন দিয়ে সেটি পড়ে সত্যি সত্যি খুব রেগে চাকরটাকে মারতে তাড়া করলো রাজপুত্র। অমনি চাকরটা দ্বিতীয় চিঠিটা রাজপুত্রের দিকে বাড়িয়ে দিল। সে চিঠিখানা পড়ে আশ্চর্য ব্যাপার, রাজপুত্র শান্ত হ'ল আর করুণার চোখে তাকিয়ে দেখলো চাকরটাকে। খানিকবাদে বললে, আচ্ছা তুই যা। চাকরটা চলে যেতেই যুবরাজের মুখে দেখা গেল হাসির ঝিলিক।

এখন তো মনে হ'চ্ছে সে খুব খুশী। কারণ প্রমাণ হয়েছে যে কাঠুরে কন্যা সত্যিই খুব বুদ্ধিমতী! তাহ'লে কি আর দেরী করা চলে? অমনি লোক লস্কর জুড়ি গাড়ি পাঠানো হ'ল কাঠুরে কন্যাকে আনতে।

কাঠুরে সব দেখে শুনে বলল, রাজপুত্র যে চিঠিখানা দিল তার কিছু মানে বোঝা গেলনা আর তুই যে চিঠি দু'টো দিলি তারও কিছু বুঝলাম না; শুধু ধাঁধার মত মনে হ'ল। মেয়ে কথা শুনে হেসে বললে, রাজপুত্র ওই চাকরটার হাতে বারোটা হাতগড়া রুটি, একটা গোলাকার মাখন, ছাগলের চামড়া দিয়ে মোড়া দু'টো ঘটি ভর্তি করে দুধ পাঠিয়েছিলেন। আর সেই কথাই হেঁয়ালী করে তাঁর পাঠানো চিঠিটাতে লেখা ছিল যাতে চাকরটা কিছু না বুঝতে পারে। ওদিকে পাজী চাকরটা রাস্তায় একটা রুটি, আধখানা মাখন আর দু'ঘটি দুধ সব খেয়েছে। কিন্তু বেচারা, ওর জন্যে আমার খুব কষ্ট হ'ল। তাই শেষ চিঠিটায় লিখলাম, আমায় পরীক্ষা করতে গিয়ে ওকে যেন মিথ্যে শাস্তি না দেওয়া হয়।

কেননা প্রথম চিঠিটাতে আমায় লিখতেই হ'য়েছে রাজপুত্রের পাঠানো জিনিসের মধ্যে আমি কি কি পেয়েছি। তাতে চাকরের ওপর রেগে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলই।

এর পর কাঠুরের মেয়েকে রাজবাড়ীতে এনে খুব ধুমধাম ক'রে বিয়ের ব্যবস্থা হ'ল। হ'য়েও গেল বিয়ে। কিন্তু সেই যে নাচ গান আনন্দ হৈ-চৈ শুরু হ'য়েছিল তার বুঝি আর শেষ নেই। শেষ নেই তো কি আজও চলছে? ধর তাই।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুমতি বিছানার ওপর উঠে বসলো : হ্যাঁ, আমাকে তো বলতেই হবে সব। জানেন সুমন্তবাবু, আমি হয়তো অনেক পাপ করেছি নইলে এত কষ্ট আমার হবে কেন ?

—আপনি এতো অধৈর্য হবেন না। দেখুন, একটা দুর্ঘটনা যখন ঘটেই গেছে তখন তার তো প্রতিকার হওয়া দরকার। আপনি কি চান না যে প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে ?

সুমতি উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

—চাই বইকি। সর্বান্তঃকরণে চাই যেন প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে। আপনারা প্রকৃত অপরাধীকে ধরে দেবেন এই বিশ্বাসেই তো আমি বুক বেঁধে আবার উঠে বসেছি আর এসব ভয়ানক আর বীভৎস কথাগুলো নিয়ে আবার আলোচনা করছি, নইলে—

—তা আমি জানি! আমরা সরকারী কাজ করি বটে তবে আমরা মানুষ তো বটে। আমরা বুঝি আপনার কষ্ট এবং এ সব আলোচনা করতে যে আপনার কত কষ্ট হয় এবং আমরাও আপনাকে এ সব জিজ্ঞাসা করে নিদারুণ কষ্ট দিচ্ছি সন্দেহ নেই কিন্তু কী করবো বলুন, অপ্রীতিকর কর্তব্য তো করতেই হবে।

—বলুন, আপনারা কী জানতে চান। সুমতি এবার স্থির হয়ে বসলো বিছানার ওপর।

—সূর্যকান্তকে তো আপনি নিজের ছেলের মতই ভালবাসতেন।

—নিশ্চয়ই—

—নিজের ছেলেকে হারিয়ে আপনি সূর্যকান্তকে পেয়ে অনেকটা পুত্রশোক ভুলেছিলেন না?

—আগেই তো বলেছি আপনাদের আমার ছেলেকে অকস্মাৎ হারিয়ে আমি প্রায় পাগলের মত হয়ে যাই। সবাই বলতো তখন সাময়িকভাবে আমার মাথাও খারাপ হয়ে যায়। তখন দাদা আমাকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়ীতে। এ বাড়ী এসে দেখলাম বৌদি মারা গেছেন। সূর্যকান্ত একেবারে ছোট, তাকে দেখবার মত কেউ নেই। তখন আমিও যেন সূর্যকান্তকে বুকে তুলে নিয়ে অনেকখানি শান্ত হলাম।

—তা তো হবেনই—তারপর বলে যান।

—সূর্যকান্ত ছোটবেলায় অত্যন্ত রুগ্ন ছিল। প্রায়ই ভুগতো। দাদা বলতেনও—ও বাঁচবে না। কিন্তু আমি সে কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না। বরং আরো সব সময় ওকে যত্ন আর চোখে চোখে রাখতাম। যাতে মা-মরা ছেলেটা যেন কোন মতে মার অভাব অনুভব না করে।

—কিন্তু আপনার ছেলে কী হয়ে মারা গিয়েছিল তা তো বললেন না।

হঠাৎ কথা বলতে বলতে সুমতি থেমে গেল। ওর চোখ দুটো যেন কেমন অস্বাভাবিক হয়ে বসে যেতে লাগলো। সে বিকৃত গলায় একটা চিৎকার করে উঠলো: একটা কথা তো হচ্ছে এর মধ্যে আর একটা প্রসঙ্গ আনা কেন? আর এভাবে যদি কথায় কথায় বাধা দেন তা হলে আমি কোন কথাই বলবো না।

অসীম আর সুশান্ত দুজনে পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলো: আচ্ছা—আচ্ছা আমাদেরই দোষ হয়েছে। আমরা ক্ষমা চাইছি। আপনি বলে যান।

কিন্তু সুমতির রক্তচক্ষু যেন প্রকৃতিস্থ হতে কিছুতেই চাইছে না। বাড়ীর পুরোনো গোমস্তা গোবর্ধন হালদার বললে: পিসিমা মুখে তো একটু জলও দিলে না। কত বেলা হয়ে গেল। একটু জল দাও মুখে তারপর বল।

—না, না। তুই যা তো আমার সামনে থেকে। আমাকে খাবার কথা যদি বলিস তাহলে টেবিলের ওপর থেকে পেপারওয়েট তুলে মারবো কিন্তু। যা—আমার সামনে থেকে চলে যা—

গোবর্ধন বললে: যাচ্ছি যাচ্ছি। তারপর সুমন্তের দিকে তাকিয়ে বললে: দেখছেন তো ওঁর কী অবস্থা। আর আমাদের সে পিসিমা কী আর আছে? আমাদেরও কপাল নইলে অমন লক্ষ্মী প্রতিমার মত মানুষ কেনই বা এতো শোক পাবেন আর কেনই বা এমন করে ভেঙ্গে পড়বেন। আমাদেরই কপাল বাবু, আমাদেরই কপাল। বলতে বলতে গোবর্ধন চলে গেল।

কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা না কাটলে সুমতিকে কিছু বলা যাবে না কাজেই সুমন্ত আর অসীম উঠে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে ওরা দরজার কাছে এসে গোবর্ধনকে ডাকলো।

সুমতি কিন্তু বিছানার ওপর শুয়ে পড়লো না। যেমন বসেছিল ঠিক তেমনি-ভাবেই বসে রইলো।

সুমন্ত গোবর্ধনকে ডাকলো: শোন তো, তোমাকে একটু দরকার আছে।

—বলুন বাবু কি আদেশ করছেন।

—সূর্যকান্ত মজুমদার যখন খুন হলো তখন তুমি কোথায় ছিলে?

—বাবু তখন তো সবে সকাল সাতটা। আমি উঠে ঘরের সব কাজ-কর্ম সেরে দাদাবাবুর জন্যে চা করে নিয়ে এসে দেখি দাদাবাবু মাটিতে পড়ে আছে।

—হুঁ—সুমন্ত বললে। ঘরের জানালাগুলো খোলা না বন্ধ ছিল?

—সব বন্ধ ছিল।—গোবর্ধন বললে।

—ঘরের দরজা?—

—খোলা।—

—কেন? সুমন্ত জানতে চাইলো।

—দাদাবাবুর ঘরের সঙ্গেই পিসিমার ঘর। ভেতরে দরজা আছে। রোজ পিসিমা ভোরে উঠে দাদাবাবুর ঘরের দরজা খুলেই বেরিয়ে আসে। তারপর পুজো সেরে আশীর্বাদী ফুল দাদাবাবুর মাথায় ঠেকিয়ে কাজে হাত দেয়। আজও অন্যদিনের মতই পিসিমা উঠেছিলেন।

—তারপর কী করলেন?

—স্নান সেরে যেমন রোজ করেন তেমনি পুজোর ঘরের দিকে চলে গেলেন। আমারও অন্য কাজ ছিল কাজেই আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। নিজের কাজে চলে গেলাম। এসে দেখি দাদাবাবু রক্তে স্নান করছেন আর পিসিমা পাগলের মত চিৎকার করছেন।

—কি বলছিলেন উনি? অসীম জিজ্ঞেস করলো।

—কি বলছিলেন সে কথা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। খানিকটা গোঁঙানির মত আওয়াজ। চোখের দৃষ্টিও ঠিক যেন পাগল। হয়তো শোকেই ওর ওই অবস্থা।

সুমন্ত চুপ করে শুনছিল কথাগুলো। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন: আচ্ছা তুমি যাও। আমরা নিজেরাই একটু কথাবার্তা বলবো।

সুমন্ত ঘরের বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। তারপর চারদিকে একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিলো। বাড়ীটি বিরাট। চারদিকে বাগান, মাঝখানে বাড়ীটা। বাগানটি ফুলে ফুলে ভরা। যেখানে সূর্যকান্তের শোবার ঘর সেখানে একটা বারান্দা রয়েছে ঠিক ওর ঘরের সঙ্গে সঙ্গে লাগানো। ওরা সেই ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সেখানে তখনও একটা চেয়ার পাতা ছিল। চেয়ারের ওপর একটা কাপ ডিস রাখা আছে। সুমন্ত শুঁকে দেখলো ওটা কফির কাপ।

—তাহলে রাতে বাড়ী এসে সূর্যকান্ত নিশ্চয়ই ক্লান্ত বোধ করেছিল—অসীম বললে।

ক্লান্ত-বোধ তো সব সময়ই করতে পারে যে কেউ।—চিন্তিত ভাবে সুমন্ত বললো। এর থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।

অসীম বললে: তা হয় না বটে কিন্তু গোবর্ধন তো একবারও বললো না যে সূর্যকান্ত বাড়ী এসে কফি খেয়েছিল।

—কফি খেয়ে সে উঠে ঘরে গিয়েছিল—তা নইলে চেয়ারে কফির কাপ বসানো থাকতো না। অসীম আবার বললে।

—তা সবই হতে পারে কিন্তু তুমি লক্ষ্য করেছ কি সূর্যকান্তের লাস যখন ঘরের ভেতরে পড়ে ছিল সেখানে কেউ ছিল না।

—তা তো লক্ষ্য করেছি।

—গোবর্ধন তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল—সেটা লক্ষ্য করেছ?

—হ্যাঁ, স্যার লক্ষ্য করেছি।

কিন্তু সুমতির তো কোন কাজই ছিল না। তা সত্ত্বেও সে কেন সূর্যকান্তের ঘরে ছিল না?

অসীম মাথা চুলকোতে লাগলো।

যাকগে এ সব কথা; লাস তো নিয়ে গেছে ওরা। চল একবার দেখে আসি ঘরটা ওরা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে গেছে কিনা।

ওরা এগিয়ে গেল। যে ঘরে সূর্যকান্তের দেহ ছিল পড়ে সেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলো ওরা। না, ঘর ওরা খুব ভাল করেই বন্ধ করে দিয়ে গেছে। চাবিটা সুমন্তর পকেটে। ও একবার হাত দিয়ে দেখলো। না, সব ঠিক আছে।

—অসীম ?

—বলুন—

—চল এবার—একটু হেসে বললেন।

—কোথায় বলুন তো—? অসীম বললো।

—এতক্ষণে সুমতি দেবী নিশ্চয়ই শান্ত হয়েছেন। এখনও ওঁকে আমার অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে। চল যাই।

—ওঁকে যেমন দেখলাম তাতে আবার কিছু জিজ্ঞেস করলে তো চটে উঠবেন না ?

—উঠলে আর কি করা যাবে। ওঁর যা অবস্থা তাতে তো চটে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে তো আর আমরা কর্তব্যে অবহেলা করতে পারি না।

—চলুন। কিন্তু উনি যেমন করে উঠেলন তাতে তো আমার ভয়ই করতে লাগলো।

—হুঁ,—খুব গম্ভীর ভাবে বললে সুমন্ত।

ওরা বারান্দা পার হলো। তারপর ঘর। তারপর আবার বারান্দা সব কিছু পার হয়ে ওরা এসে দাঁড়ালো সুমতির ঘরের সামনে। উনি তখন বিছানার ওপর মাথায় হাত রেখে বসে ছিল স্থির হয়ে।

সুমন্ত বললো: আসতে পারি ?

—আসুন! স্থির কণ্ঠে সুমতি বললো।

মাথা তুললেই সুমন্ত লক্ষ্য করলো সুমতির চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমেছে।

(ক্রমশঃ)

মূল কাহিনীর অনুলেখন: আশা দেবী

হাবুল গাবুলের কীর্তি

কাহিনীঃরবিদাস সাহারায়
চিত্রঃমৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

● হাবুল গাবুলের কীর্তি

(চলবে)

ওরা খুনী

সুভাষ ঘোষাল

মহানগরীর রাজপথ।

অতি কর্মব্যস্ত মানুষ। সময়ের কাঁটা নটার ঘরে। হাজার হাজার যানবাহনে লাখ লাখ মানুষের যাত্রা। দশ বারো ঘণ্টার নীরবতার পর অফিস পাড়াকে মুখর করা নিত্যদিনের মিছিল।

শহরের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে মানুষের বোঝা নিয়ে একটি বাসও যোগ দিয়েছে এই মিছিলে। অফিস যাত্রীরা অসহিষ্ণুতায় গর্জে ওঠে—জোরে চালান না মশাই! হাত চালিয়ে, হাত চালিয়ে ড্রাইভার! অফিসে লেট হলে কি আপনি কৈফিয়ত দিতে যাবেন মশাই?

গাড়ীর পেছনের দিকে আরেকটি কণ্ঠে যেন বজ্রধ্বনি ওঠে—দাদা কি সাবু খেয়ে এসেছেন? তেড়ে চালাল না মশাই। এতগুলো প্যাসেঞ্জারকে অফিসে লেট করালে কিন্তু অক্ষত দেহে আজকে আর বাড়ী ফিরতে পারবেন না।

ড্রাইভার বাঁ হাতে কপালের ঘাম মোছেন। অমানুষিক পরিশ্রম। তার ওপর বাক্যবাণের খোঁচা। উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ড্রাইভার—এঃ, মার দেওয়া কি ছেলের হাতের মোয়া? আপনার রক্তচক্ষু দেখে কি পঁচিশের বদলে গাড়ীর বাহান্ন স্পীড তুলে দেব?

বাসের একদম সামনের দিকে বসা একজন প্রৌঢ় যাত্রী চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমার তো সাহস কম নয়? এতগুলো প্যাসেঞ্জারের সাথে আবার তর্ক!

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পাশে বসা আরেকটি যুবক মরিয়া হয়ে ওঠে—পাবলিকের অর্ডার। ইউ মাস্ট ক্যারি আউট। মাইণ্ড দ্যাট। তুমি এই পাবলিকেরই পয়সা দিয়ে কেনা গাড়ীর ড্রাইভার।

ড্রাইভার রেগে ওঠেন—হাঁ, আপনার খাসমহলের প্রজা। ইউ প্লিজ মাইণ্ড দিস—যতক্ষণ আমার হাতে গাড়ী, ততক্ষণ গাড়ীর মালিক আমি নিজে।

ছেলেটি সীট থেকে লাফিয়ে ওঠে—এঃ, বামনের আবার চাঁদ ধরবার সাধ!—গাড়ীর মালিক আমি নিজে। আহা মরি। চালাও তুমি জোরে। মাই অর্ডার। ঘড়িতে অধৈর্য্যের সাথে চোখ বুলিয়ে নেয় তরুণটি।—ইস্! আর মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে দশটা বাজতে। চালাও বলছি জোরে।

সাথে সাথে সমস্বরে সমর্থনের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হলো—পাবলিক সারভেণ্ট হয়ে আবার পাবলিকের মুখে মুখে তর্ক?

ড্রাইভার আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—ডিকসেনারী থেকে পাবলিক শব্দের মানেটা শিখে নিয়ে তবে তর্ক করতে আসবেন।

যুবকটি একবার পেছনের দিকে তাকিয়ে নেয়।—কি, এতবড় কথা? হাতের আস্তিন গোটাবার সে মহড়া নেয়।

সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এবং আরও আট-দশ জন যাত্রী একসাথে এবার ধলে ওঠেন—ড্রাইভারটার আস্পর্ধা তো কম নয়! গলাটা তাদের আরও উঁচুতে ওঠে—চালাও জোরসে। চালাও, চালাও বলছি। ইডিয়েট! এদিকে অফিসের টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে আর উনি বিদ্যে জাহির করছেন।

চুপ ক'রে থাকা একটি যাত্রী নরম সুরে সেই সমস্বরের প্রতিবাদ করেন—স্পীড বাড়িয়ে কি শেষে একটা এ্যাক্সিডেণ্ট ঘটাতে চান আপনারা?

আবার যাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—চুপ করুন তো মশাই। আপনাকে কে আবার দালালি করতে বলেছে? ওঃ, হাই স্পীডে গাড়ী চালাবে না। ওর ঘাড় চালাবে!

ড্রাইভার পাল্টা জবাব দেয়—আমার মাথা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ঘাড় চালাবে না। ঘাড় আমার মাথার আদেশ পালন করতে বাধ্য।

যুবকটি এবার শিকের বেড়ার ভেতর দিয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায়।—বাড়াও, স্পীড বাড়াও বলছি। জলদি বাড়াও।

দরদর করে ড্রাইভারের গা দিয়ে ঘাম ছুটছে। আবার বাঁ হাত দিয়ে ঘাম মোছেন ড্রাইভার। উত্তেজনায় সারা দেহে তাঁর অসম্ভব কাঁপুনি দেখা দেয়। ঘাড় ফিরিয়ে উত্তেজিত যাত্রীদের জবাব দিতে গিয়ে গাড়ীটা হয়ে পড়ে বেসামাল। চোখ দু'টো তাঁর রেড সিগ্‌নালকে এড়িয়ে যায়। রাস্তা পার হওয়া পথিকের ওপর বাস গাড়ীটি ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়। সাথে সাথে ওঠে আর্তনাদ। ড্রাইভার সচকিত

হয়ে গতি সামলাতে যেয়ে ফুটপাতের ওপর গাড়ী তোলেন। গাড়ীর চাকায় একটি প্রাণী রক্তমাংসের তালে পরিণত হয়। আর কয়েকজন পথচারীও হলো কম-বেশি আহত। গাড়ীর যাত্রীদের অবশ্য কোন ক্ষতি হয়নি। মার মার শব্দে রাস্তার মানুষগুলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ড্রাইভারের ওপর।—মার ড্রাইভারকে! ধর খুনীকে!

বাস গাড়ীটার যাত্রীরাও তখন মারমুখো ঐ জনতার সাথে এসে যোগ দেয়। —মার ড্রাইভারকে! শেষ ক'রে দাও খুনীকে!

বাস ড্রাইভার কিন্তু জনতার রোষানলকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করেন না। ক্রুদ্ধ মানুষের কিল, চড়, ঘুষি উপেক্ষা ক'রে উন্মত্তের মত এগোতে থাকেন।—দেখি, দেখি—কে চাপা পড়লো? আমার মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে! সরুন, সরুন তো আপনারা। আঃ! আপনারা সরুন। রাস্তা ছেড়ে দিন আমাকে। মনে হচ্ছে, বড্ড চেনা মুখ আমার। ইস্! একদম থেঁতে গেছে যে! উঃ—হু হু হু, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে!

আর্তনাদ ক'রে ভেঙ্গে পড়লেন ড্রাইভার!

ক্রুদ্ধ জনতার ভেতর থেকে এক সাথে বিদ্রূপের অগ্নিবর্ষী গোলা ছুটে আসে। —পালাবার তালে আছে শয়তানটা। ওকে কেউ যেতে দেবেন না মশাই। যেতে দেবেন না। জ্যান্ত পুঁতে ফেলুন ওকে! ওরা খুনী!

ড্রাইভার আরও হিংস্র বাধা পেয়ে মরিয়া হয়ে ওঠেন। তাঁর নিজের হাতে ঘটা এই সর্বনাশের তিনি সাক্ষী হতে চান। মারমুখো জনতার প্রহার-বর্ষণ, বাক্য-বাণ, রক্তের টানের গতিকে ফেরাতে পারে না। রক্তাপ্লুত জ্যান্ত দেহটা সেই নির্জীব মাংসতালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।—কানু। কানু। আমি জানতুম তুই পাশ করবি। তবে কেন তাড়াহুড়ো করে রেজাল্ট জানতে বেরিয়েছিলি বাবা? ধর্মতলার গুমটি থেকে সরোজের কাছে শুনে এসেছি কাগজে তোর রোল-নম্বর ছাপা হয়েছে। তুই ফাষ্ট ডিভিশনে পাশ করেছিস।

হিংস্র জনতার হিংস্রতা হঠাৎ থিতিয়ে পড়লো।—কি সর্বনাশ! নিজের ছেলেকেই তাহলে তো চাপা দিয়েছে? তাহলে তো চাপা দেয় নি। চাপা পড়েছে। নইলে নিজের ছেলেকে……!

জনতার ভেতর থেকে তিন-চারজন মানুষ ড্রাইভারকে সেই রক্তমাংসের পিণ্ডের

ওপর থেকে টেনে তুলতে যায়। কিন্তু ড্রাইভার আঁকড়ে থাকেন তাল পাকিয়ে যাওয়া ছেলের ধড়টাকে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে উন্মত্তের মত আর্তনাদ করে ওঠেন —কেন, থামলেন কেন অফিস-বাবুরা? মারুন, মেরে, মেরে, আমাকেও মেরে ফেলুন আপনারা। নিজের ছেলেকে যে মারতে পারে তার চাইতে বড় খুনী আর কে আছে!

বলতে বলতে হঠাৎ নিজের মাথাটাকে ফুটপাতে ঠুকে দেয় ড্রাইভার। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে। জনতার ভেতর থেকে চীৎকার ওঠে—হাসপাতাল। এ্যাম্বুলেন্স্, এ্যাম্বুলেন্স। শীগ্‌গির নিয়ে চলুন হাসপাতালে!

অবাক ভাড়াটে

জনৈক বাড়িওলা তাঁর হবু ভাড়াটেকে ঘর দেখাচ্ছেন—এই যে দেখুন, এই দু'খানা ঘর। দু'খানারই দক্ষিণ দিক খোলা। আলো-বাতাসের কোনো অভাব নেই। দু'টো ঘরেই ফ্যান লাগাতে পারবেন। এছাড়া আলাদা রান্নাঘর দেখবেন আসুন, বাথরুমও আছে।

থাক থাক হবু ভাড়াটে বাধা দিয়ে বললেন—ভাড়াটা কত বলুন ত?

বিনীতভাবে বাড়িওলা জবাব দিলেন,—আজ্ঞে মাত্র তিনশ' টাকা। কিন্তু রান্নাঘরটা দেখুন—আর

হবু ভাড়াটে চোখ কপালে তুলে বললেন—তিনশ' টাকা! তবে থাক, রান্না-ঘর দেখে কাজ নেই। কারণ ওটার আর দরকার হবে না।

সেকি মশাই! রান্নাঘরের দরকার হবে না—কি বলছেন আপনি? রান্নাবান্না করবেন না? বাড়িওলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন। হবু ভাড়াটে জবাব দিলেন —আপনার বাড়িতে থাকতে গেলে দরকার হবে না।

কেন, কেন? আমার বাড়িতে থাকতে গেলে রান্নাঘরের দরকার হবে না, মানে? অবাক বাড়িওলা প্রশ্ন করলেন।

কারণ মাসে আমার মাইনে মাত্র তিনশ' টাকা। আপনার বাড়িতে থাকতে গেলে আমাকে সারা মাস উপোস করে কাটাতে হবে। রান্নাঘরের দরকারটা হবে কি করে বলুন?—হবু ভাড়াটে জবাব দিলেন।

বিজ্ঞানের আজব কাহিনী

—সবজান্তা

আচ্ছা, বল তো সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, না পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে? তোমরা তখন চটপট জবাব দেবে, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কিন্তু প্রায় পাঁচশো বছর আগে যদি তোমরা জন্ম নিতে তা হলে কি এরকম জবাব তোমরা দিতে পারতে? তখন বলতে সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।

রেলগাড়ীতে তোমরা নিশ্চয়ই উঠেছ। চলন্ত রেলগাড়ীতে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে হবে, গাড়ীর দু'ধারের বাড়িঘর, গাছপালা, যেন ছুটে চলেছে, আর রেলগাড়ীটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এ ব্যাপারটা তো দৃষ্টি বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। একটু ভাল ভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পার যে, ট্রেনখানাই ছুটে চলেছে, দু'ধারের বাড়িঘর, গাছপালা যেমন ছিল তেমনি স্থির হয়েই আছে। ঠিক সেইরূপ ঘূর্ণমান পৃথিবীতে বসে মানুষের মনে ধারণা হয়েছিল সূর্যটাই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।

১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ছোট্ট একখানা বই প্রকাশিত হওয়ার ফলে মানুষের চিন্তাধারায় আলোড়ন দেখা দিল। সেই বইয়ের লেখক ছিলেন নিকোলাস্ কোপারনিকাস্। সেই বইয়ে এমন সব কথা লেখা ছিল, যার ফলে মানুষের চিরন্তন বিশ্বাসের মূলে আঘাত পড়ল। কোপারনিকাসের জন্মের প্রায় চৌদ্দ শ' বছর আগে বিখ্যাত মিশরীয় জ্যোতিষী টলেমী প্রচার করেন যে, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী অবস্থিত এবং পৃথিবী চিরস্থির। আর তার চারদিকে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি। এরা প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

মানুষের মনে আগে থেকেই এই রকম একটা ধারণা ছিল। টলেমীর প্রচারের ফলে সেই ধারণা আরও দৃঢ় হল। কিন্তু কোপারনিকাস যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন যে, টলেমীর সিদ্ধান্ত ভুল। তিনি প্রচার করলেন যে, "ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর ন্যায় বহু পৃথিবী আছে, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র আছে, তারা সকলেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। অতি বিরাট সূর্য এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং সূর্য চিরদিন এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। তাই এই জগতের নাম সৌরজগৎ।"

১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলাস্ কোপারনিকাসের জন্ম হয়—পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত

প্রাসিয়া প্রদেশের থণ নামক এক ক্ষুদ্র শহরে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ভাল ছবি আঁকতে পারতেন, অঙ্কে তাঁর খুব মাথা ছিল। কিন্তু বড় হয়ে পড়তে শুরু করলেন ডাক্তারী। তাও আবার খেয়ালের বশে ছেড়ে দিলেন। তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা হল তিনি বৈজ্ঞানিক হবেন।

কোপারনিকাসের এক খুড়ো ছিলেন ধর্ম-যাজক। তাঁর পরামর্শে কোপারনিকাস্ পুরোহিতের কাজ শুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সাধারণ পুরোহিতের পদ থেকে কোপারনিকাস্ হলেন মঠের অধ্যক্ষ। আগে প্রত্যেক মঠের সঙ্গেই এক একটা বিদ্যালয় থাকত। আজকালকার মত স্কুল কলেজ সে যুগে ছিল না। শিক্ষাদানের কাজটা তখনকার দিনে খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীরাই করতেন।

মঠের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে কোপারনিকাস্ গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করলেন। সেই সময়ে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। জ্যোতিষবিদ্যার চর্চাও তিনি সেই সময়ে শুরু করেন। বর্তমানে জ্যোতিষবিদ্যা অনুশীলনের জন্য কত রকম যন্ত্রপাতি রয়েছে, কিন্তু সেযুগে তা কিছুই ছিল না। এখন যেসব শক্তিশালী দূরবীন্ আর উঁচু মান-মন্দিরের সাহায্যে জ্যোতির্বিদরা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করে থাকেন সেযুগে তা কল্পনার অতীত ছিল। কাজেই কোপারনিকাস্‌কে বহু অসুবিধা ও বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়েছে।

তবু দমে যান নি কোপারনিকাস্। তিনি ঘরের দেয়াল ফুটো করে তার মধ্যে নিজের তৈরি অতি সাধারণ একটি যন্ত্র বসিয়ে নিয়েছিলেন। সেই যন্ত্রের ভিতর

দিয়ে তিনি সমস্ত রাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন, আর কাগজে তাঁর এই পর্যবেক্ষণের ফল লিখে রাখতেন। ঐ ফুটোর ভেতর দিয়ে তিনি একটা কম্পাসের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান নির্ণয় করে পরিমাপ করতেন এবং নক্সা তৈরি করে এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহ কতদূরে অবস্থিত তা স্থির করবার চেষ্টা করতেন।

এই ধরণের যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করবার ফলে তাঁর যে কিছুটা ভুলচুক হত তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে দূরবীন নামক যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সঠিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়েছে, কিন্তু কোপানিকাসের তত্ত্ব ভুল বলে কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি।

কয়েক বছর কি কঠোর পরিশ্রম করেছেন কোপারনিকাস। খাওয়া-দাওয়া ও ঘুম তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। তারপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—পৃথিবী এবং আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র সমস্তই সূর্যকে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য স্থির হয়ে বসে আছে সৌরজগতের মাঝখানে।

কি যে পরিশ্রম তা কল্পনাও করা যায় না। অসম্ভব পরিশ্রমের ফলে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এত দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, তাঁর পক্ষে নড়াচড়া করা পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে তাঁর গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে একখানা বই লেখা শেষ করলেন। বিছানায় শুয়ে থেকে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, বইখানা হয়ত ছাপা অবস্থায় দেখে যেতে পারবেন না।

কিন্তু ভাগ্য ভাল, তাঁর মৃত্যুর আগেই বইখানা প্রকাশিত হল। ছাপা বই হাতে পেয়ে মৃত্যুশয্যাতেও তাঁর কি আনন্দ! কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি এত ক্ষীণ হয়ে গেছে যে-নিজে বইখানা পড়তে পারলেন না।

অথচ সেই বই পড়েই পৃথিবীর মানুষের চোখের নূতন দৃষ্টি খুলে গেল। মানুষ খুঁজে পেল এক নূতন তত্ত্ব। বহুদিনের ভুল তাদের ভেঙে গেল।

বেশ কিছুদিন আগের কথা,—অর্থাৎ সময়টা তখন সবেমাত্র বদল হ'তে আরম্ভ ক'রেছে—ভারতের ভাগ্যাকাশেও সে বদল রাজনৈতিক দিক দিয়ে তো বটেই—শিক্ষায় এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও।.....

অর্থাৎ—এদেশটার একদিক থেকে আর একদিক জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে—শাদা-মানুষের স্বার্থ সিদ্ধির আইনের জাল। সে জালে শুধু ভারতের ধনী-সম্প্রদায়ই নয়, সঙ্গতি-সম্পন্ন গৃহস্থরাও জড়িয়ে প'ড়ছেন একে-একে, জড়াচ্ছে বুদ্ধি-বৃত্তি আর সৎশিক্ষা পাওয়া মানুষেরাও।—এ কাহিনী সেই সময়ের.....

উত্তর বাংলার রংপুর জেলা, আর এরই কাছ দিয়ে ব'য়ে চ'লেছে ব্রহ্মপুত্র নদ।

এপার থেকে ওপার যার দেখা যায় না আর ওর জলের স্রোতের টানও এত তীব্র—যে এড়ানো মুস্কিল। এরই কিছুদূরে—জমিদার শঙ্কর নারায়ণের পৈতৃক ভিটা। যে ভিটায় আজও মাথা উঁচু ক'রে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাবেকি নহবৎখানা আর প্রকাণ্ড বড় লোহার ফটক; অন্য পাশে ঝুলছে বিবর্ণ ঘণ্টা-ঘড়িটা। আজ আর সে ঘড়ি কেউ সময়মত না বাজালেও একদিন বাজাত।

প্রকাণ্ড বাড়িটার গায়ের মাঝে মাঝে চূণ বালি খ'সলেও—একদিন এই বাড়িকেই সকলে ব'লতো এ দেশের 'রাজবাড়ী'—কারণ, ওরই কাছারী বাড়িতে

ব'সে এক একদিন শঙ্কর নারায়ণের পিতৃপুরুষ করতেন প্রজাদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের বিধান।

এক কথায়—দুষ্টের দমন, আর শিষ্টের পালন।

কিন্তু, আজ? এখন? —এতদিন পরে?···

সচকিত হ'য়ে ওঠেন শঙ্কর নারায়ণ।······

মনে হয়—কারা যেন কাঁদছে না?···কাদের কান্না ভরা গলার আওয়াজ যেন —বৈঠকখানার ঐ সারেঙ্গীর সুর ডুবিয়ে দিয়ে ভেসে আসছে না তাঁর কানে?—ঐ না তারা ডাকছে তাঁকে? ব'লছে—

"রাজাবাবুগো, তুমি থাকতে—আমাদের বুকের ওপর বাঁশ ড'ল্‌ছে কোম্পানীর সায়েবরা! জমি নিচ্ছে 'নীল' চাষের জন্যে,—মেয়েদের করছে—বে-ইজ্জত্, আর আমাদের পেটে বুকে মারছে বুটের লাথি। তুমি তো বাঁচাতে পারলে না আমাদের! এ তুমি কেমন রাজা, কেমন জমিদার—?"······

শঙ্কর নারায়ণ উঠে যান—আনন্দ-উৎসব ছেড়ে। শুনতে পান—ওরা, ঐ তাঁর সব গরীব প্রজারা যেন কাঁদছে! সাক্ষী মানছে ভগবানকে,—আর অভিসম্পাত দিচ্ছে তাঁর শক্তিহীন পদবীকে।

জমিদারীর সীমানায় বসবাস করে যে সব প্রজা,—তবু তাদের নালিশ তাঁকে জানতে হয় ক্রমাগত; প্রতিবাদও জানাতে হয়—উপর মহলে।

কিন্তু সে প্রতিবাদ শুনবে কে?

যে আর্জিগুলো ডাক-মাশুল নিয়ে রপ্তানী হয়, সে সব জমা থাকে অন্য জায়গায়। কেউ তাকায় না সে দিকে, পড়েও না তাদের নালিশের কাহিনী। এরই সঙ্গে-সঙ্গে তৈরী হ'য়ে আসে চিরস্থায়ী ভূমি-স্বত্বের বন্দোবস্ত, নতুন ফাঁশ ওদের আইনের—যার ফাঁদে বাংলার মানুষ, জমির মালিকরা জড়িয়ে প'ড়তে বাধ্য—আর তার পুরস্কার মিলবে—তাঁদের পক্ষে মানা দিক দিয়ে অপমানিত, লাঞ্ছিত হ'য়ে বাঁচা! তবুও যদি ওঁরা—নিজের কথা না ভুলতে চান, তাহ'লে তার ব্যবস্থাও আছে! আছে অন্য উপায়!

······কারণ?—[redacted] মানদণ্ড দেখা দেছে রাজদণ্ড রূপে—।"

নিস্তব্ধ রাত্রি। আকাশ অন্ধকার,—তবু সেই অন্ধকারকে ছিদ্র ক'রেই যেন কয়েকটা উজ্জ্বল তারা জ্বলছে।

ঐ দিকেই মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন শঙ্কর নারায়ণ, আর ভাবছিলেন,—ওরা কি পৃথিবীকে দেখতে পায়? ওখান থেকে—কেউ খবর রাখে এখানকার সাধারণ মানুষের? শুনতে পায় তাদের হাসি-কান্নার আওয়াজ? বুঝতে পারে তাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের সম্ভাবনাকে?

বোধহয় না।·····

খোলা ছাদে একা পায়চারী কর'ছিলেন শঙ্করনারায়ণ; পেছন থেকে ডাক আসে তাঁর একমাত্র সন্তান—মায়ার·····

—বাবা!

—কি মা?

—তুমি এখনও ঘুমাতে যাওনি? এদিকে রাত তো অনেক হ'ল।···

শঙ্করনারায়ণের বার্ধক্য-জর্জরিত মুখের রেখায় ভেসে ওঠে একটু বেদনার হাসি—

ঘুম যে আসতে চায় না মা! ভাবনা,—চারিদিকে কেমন একটা বিপদের সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছি যেন!

—কারণ?

—কারণ, জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে কাল সকালেই তাঁর সঙ্গে শিকারে যেতে। তাই ভাবছি, যে কালেক্টর সাহেব এ জেলায় আসা পর্যন্ত কেবল আমার ত্রুটীই ধরেছেন সব কাজের, যার ফলে দু'জনেরই মনের মধ্যে কেমন একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে পরস্পরের বিরুদ্ধে। তাঁর পক্ষে এ আমন্ত্রণ জানানো কতখানি মঙ্গলের হতে পারে বলতে পার মা?

—বাবা।

—কি মা?

—তুমি না হয় কালকের শিকারে যেও না। আমারও মনে ভাল বোধ নিচ্ছে না এটাকে।

—তা হয় না মা! ওরা বিদেশী,—বিদেশ থেকে ওদের বেশীর ভাগ লোকই এসেছে এদেশের সম্পদকে লুঠ করতে। যে তার বিপক্ষে কথা বলবে তাকে

ওরা বরদাস্ত করবে না—এটা তো মামুলী কথা। তা ছাড়া বাঙ্গালীর ঘাড়ে 'ভীরু' অপবাদ ওরা অনায়াসে চাপিয়েছে; আমি সে অপবাদ মেনে নেব না মায়া। শিকারে যাবই; তবে কিছু ভাবিস না মা, বাবা তোর ঠিকই ফিরে আসবে।

অতীতের স্মৃতিপথে কে যেন দাঁড়িয়ে ঠিক এই সময়ে সাবেকের ঘণ্টা-ঘড়িতে ঘা মারলে সজোরে, ঢং। ঢং……!

ভোরের আলো ছড়াচ্ছে।

শাল-সেগুন আর অজানা গাছের পাতায় পাতায় সে আলো ছড়িয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে।

গভীর বন,—আর সে বনের একদিক থেকে আর একদিক অবধি ঘিরে ফেলেছে দুই শিকারীর লোক-লস্করে; ওদের সবল মুঠোর আঘাতে সৃষ্টি হচ্ছে বিচিত্র ধ্বনি! যাতে, বনবাসী প্রাণীরা হয়ে উঠেছে ভীত, সচকিত।

ওরা প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ওদের দ্রুত পদধ্বনি—সেই সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বাজনার শব্দ। বনের দু' দিকে দু'জন শিকারী প্রস্তুত। যে কোনও মুহূর্তেই গর্জে উঠবে ওদের মুঠোর টোটা ভরা রাইফেল, সেই সঙ্গে সবুজ বনের মাটি ভিজাবে লাল রক্তের ধারা।

এই গভীর অরণ্য-হাওয়ায় শুধু মিশে থাকবে ওদের মরণার্তনাদ।

দূরে কালেক্টর সাহেবের হাতী। সম্ভবতঃ এইদিক লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে সে, আর এদিক থেকে এগিয়ে চলেছে শঙ্করনারায়ণের প্রিয় আর বিশ্বস্ত বাহক—এ বংশের শেষ হাতীটি—'রামলাল।'

গভীর থেকে আরও গভীর বনের মধ্যে শিকারের খোঁজ করা, এ যেন একটা নেশা।

কিন্তু,—কে ঐ মানুষটি ছুটতে ছুটতে এদিকে এগিয়ে আসছে! হাঁপাচ্ছে ও! —তবু চীৎকার ক'রে ডাকে—এই হাতীর মাহুতকে—

মামা—মামা—মামা……

বিশ্বাসী মাহুত সচকিত হ'য়ে ওঠে—। শোনে,—ও উন্মত্তের মত ব'লে চ'লেছে—"বাঁচতে চাও তো পালাও; সাহেব এখুনি শিকারের ছলে কর্তাবাবুকে গুলি করবে, আমি লুকিয়ে শুনেছি।"

কথাটা শেষ ক'রেই সে যে ভাবে এসেছিল, সেই ভাবেই অদৃশ্য হয় বনের আড়ালে।

তখনই বনের ওপাশ থেকে কালেক্টর সাহেবের রাইফেল গর্জন ক'রে ওঠে—কিন্তু লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় সে গুলি। মানুষের বদলে গুলিটা বিঁধে যায় হাতীর শুঁড়ে; চীৎকার ক'রে ওঠে হাতীটা,—তারপর মাহুতের নির্দেশে ছুটতে থাকে ব্রহ্মপুত্রের দিকে।.....

শঙ্করনারায়ণ তখন তার গলায় বাঁধা নিরাপদ আশ্রয়ে।

সেদিনের সূর্যও অস্তে গেল যথা নিয়মে। সদলে কালেক্টর সাহেব কুঠিতে ফিরে আনন্দোৎসবে মগ্ন হ'লেও,—ফিরলেন না শঙ্করনারায়ণ।.....

রাত্রি নেমে এল ধীরে ধীরে। আশঙ্কায়, আর ক্রন্দনে ভ'রে উঠল—শঙ্করনারায়ণের বাসগৃহ, আর মহল। রাত্রি বেড়ে চলে—আস্তে আস্তে।

রাত্রি দুটো।

হঠাৎ সদর ফটকের কাছে শোনা যায় রামলালের সেই চির-পরিচিত গলার আওয়াজ—বৃংহতীধ্বনি।

ছুটে আসে বাড়ীর সকলে। দেখে—ফটক ছুঁয়ে রামলালের রক্তাক্ত দেহ তখনও শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে, আর ওরই গলার ঝুলিতে শঙ্করনারায়ণের দেহ ব্রহ্মপুত্রের জলস্রোতে ভিজে অচৈতন্য।

এর পরে আর বেশীদিন শঙ্করনারায়ণ বাঁচেন নি।

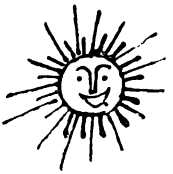

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

নাচতে নাচতে মার কাছে এসে অঞ্জু বলল,—'মা, মা, জান, দাদা না, আজও এসেছিল! আমরা কত খেললুম, কত বেড়ালুম! দাদা কোথায় থাকে গো? আসে আর খালি খালি চলে যায় কেন গো!' তারপর মার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওমা, দাদাকে বলে দেবে, চলে যাবে না— বলবে তো?'

অঞ্জুর এইসব কথা প্রায়ই শুনতে হয় সরমাকে। প্রথম প্রথম চোখে জল এসে যেত, আজকাল যা-হোক সয়ে গেছে। এখন তাঁর ভাবনা, অঞ্জনের সঙ্গে এই মেশামেশিটা অঞ্জুর পক্ষে অনিষ্টকর হবে কিনা, যদিও তাঁর দাদা বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক তাঁকে অভয় দিয়েছেন, বলেছেন আসলে সবটাই অঞ্জুর কল্পনা, আর যদি তা নাও হয় তো এর জন্যে ভয় করবার কিছু নেই। অঞ্জুর কথার উত্তরে তাই তিনি শুধু তাকে বুকে চেপে ধরলেন, বললেন, 'আচ্ছা।'

দাদার কথা অঞ্জু দিনে কতবার যে মাকে বলে! সারাটা দিন বাড়িতে একা থাকেন তিনি, অঞ্জুর বাবা কোন্ সকালে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত ন'টার পর। অঞ্জুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় কেবল সকালবেলায় ঘণ্টাখানেকের জন্যে। ছ' বছরের অঞ্জন চলে যাওয়ার পর থেকে তাঁর সমস্ত স্নেহ সমস্ত ভাবনা এখন অঞ্জুকে নিয়ে, তাই দিনে মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে তাকে পেয়ে তাঁর মন ভরে না। আরও বেশিক্ষণ তাকে কাছে পেতে চান তিনি। অঞ্জুর মাও তাকে আগলে আগলে রাখেন। আঁকড়ে রাখেন যতটা পারেন। বাড়িটা আবার এমন একটেরে যে, পাশের বাড়ি বলতে প্রায় একশো গজ তফাতের চক্রবর্তী বাড়ি; তাই প্রতিবেশীদের সঙ্গেও দেখা হয় না বড় একটা।

সেদিন সরমা তরকারি কুটতে কুটতে একটু কোথায় গেছেন, হঠাৎ অঞ্জুর আর্ত কান্নায় দৌড়ে এলেন সেখানে। দেখেন অঞ্জু তার ডান হাতের কব্জিটা বাঁ হাতে চেপে ধরেছে, বঁটির চারদিকে প্রচুর রক্ত। তাড়াতাড়ি এসে তাকে তুলে নিলেন, ডেটল দিয়ে দিলেন কাটা জায়গাটায়।

কিন্তু রক্ত বন্ধ হল না। তাড়াতাড়ি তখন গিয়ে উঠোন থেকে গাঁদা পাতা এনে তার রস করে লাগালেন। কিন্তু তাতেও বন্ধ হল না রক্ত। এতক্ষণে তিনি লক্ষ্য করলেন, একটা শিরা কেটে গেছে, যেজন্যে রক্তটা ফিনকি দিয়ে পড়ছে।

পাগলের মত হয়ে উঠলেন সরমা। এ অঞ্চলে ডাক্তার মাত্র একজনই, তিনি

থাকেন প্রায় মাইল-দুয়েক দূরে। উপায় না দেখে তখন তিনি কাটা জায়গাটায় তুলো চেপে অঞ্জুকে কোলে করে ছুটলেন চক্রবর্তী বাড়ি লক্ষ্য করে।

চক্রবর্তী বাড়ির সমীর যখন সাইকেল নিয়ে ফিরে এসে বলল, ডাক্তার বোসকে পাওয়া গেল না, অঞ্জু তখন অনেকখানি রক্ত খুইয়ে বেশ খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তখনও সমানে রক্ত পড়ছে, কোনমতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না।

পাশের গ্রাম হরিশপুরে ডাঃ বিনায়ক দত্তর কাছে তখন সমীরকে পাঠালেন চক্রবর্তী-গিন্নি। প্রায় পাঁচ মাইলের মত পথ, সমীরের সাইকেল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সেদিকে। অঞ্জুকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সরমা।—তাঁর কাপড়ের অর্ধেকটা রক্তে ভিজে গেছে। চক্রবর্তী-গিন্নিও এলেন তাঁর সঙ্গে।

মাথায় যেন বাজ পড়ল যখন সরমা শুনলেন যে সমীর ডাঃ দত্তকেও খুঁজে পায় নি। তবে, সমীর ভরসা দেবার চেষ্টা করে বলল, দুই ডাক্তারেরই বাড়িতে আর ডাক্তারখানায় সে খবর দিয়ে এসেছে, যেন এলেই তক্ষুনি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অঞ্জুর হাত কেটেছে প্রায় দু-ঘণ্টা হল, সেই থেকে সমানে রক্ত পড়ছে। বেজায় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মেয়েটি, কেমন নেতিয়ে পড়েছে মার কোলে। তিনবার কাপড় পালটাতে হয়েছে সরমাকে।

ক্রিং ক্রিং—ক্রিং ক্রিং! কার সাইকেলের বেল? আঃ! ডাঃ বোস! এসেছেন—এসেছেন ডাক্তারবাবু!

অঞ্জুর রক্ত বন্ধ করে তার জন্যে কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন, এবার ডাক্তারবাবু চলে যাবেন। সরমা বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনি বুঝি বাড়ি ফিরেই তক্ষুনি খবর পেয়ে চলে এসেছেন?

ডাক্তারবাবু বললেন, 'না তো, আমি তো বাড়ি ফিরিই নি। চন্দ্রনাথপুরে গিয়েছিলুম এক রোগীকে দেখতে। সেখান থেকে বেরিয়েছি, মথুরাপুরে আর একটা রোগী দেখতে যাব বলে, এমন সময় একটি ফুটফুটে ছেলে এসে আমায় এখানে আসবার জন্যে ধরে পড়ে, বলে তার বোনের হাত কেটে গেছে—এক্ষুনি যেতে হবে, রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। সে যদি না বলত তাহলে রাত দশটার আগে আমি আসতে পারতুম না। আর কোন ভাবনা নেই, কাল সকালে দেখবেন ও প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সে ছেলেটিকে দেখলে চিনতে পারবেন আপনি? দেখুন তো, এই কি সেই ছেলে। যে আপনাকে খবর দিয়েছিল?'

অঞ্জনের ফোটোটার দিকে একবার তাকিয়েই ডাক্তারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ছেলেটিই তো! আচ্ছা চলি, নমস্কার।'

———

(এক)

টারজানের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

স্থির হয়ে বসে থাকতে সে পারছে না। বিশাল সমুদ্র তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন তার মনকে ব্যাকুল করে তুলছে।

মাটির বুকে একটানা অনেকদিন থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে টারজানের মন। এবার সে একটু বৈচিত্র্য চায়। কোন কালেই একটানা অনেকদিন এক জায়গায় সে থাকে নি—থাকতে পারে না। তাই ভাবছে এবার সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

অনেকদিন হয়ে গেল এই দ্বীপে। এই দ্বীপের মায়া এবার ছাড়তে হবে। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা যে তাকে ছাড়তে চায় না। যদি তারা জানতে পারে টারজান চলে যাবে তা হলে কিছুতেই যেতে দেবে না তাকে। খেতে হবে তাকে পালিয়ে।

কোথায় যাবে তার কোন ঠিকানা নেই। দিনক্ষণ দেখে লক্ষ্য স্থির করে টারজান কোনদিন চলে নি, এবারও চলবে না।

রাত্রি তখন গভীর। নির্জন দ্বীপে নেমে এসেছে যেন মৃত্যুর শীতল নিস্তব্ধতা। টারজান চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল। কিছুটা হেঁটে গেলেই সমুদ্রের ফাঁড়ি, সেখানে কয়েকটা নৌকা ভিড়ানো রয়েছে। তারই একটি নৌকায় উঠে বসল টারজান। নৌকায় দু'টি বড় বড় বৈঠা রয়েছে। একটি বৈঠা তুলে নিয়ে সে নৌকা ভাসিয়ে দিল।

অন্ধকার রাত্রি। আকাশে জ্বল জ্বল করছে শুধু তারার রাশি। টারজান নৌকা-নিয়ে বিশাল সমুদ্রে ভেসে পড়ল। ফাঁড়িটার বাঁক পেরিয়েই সমুদ্রের মুখ। সেখানে পড়তেই সে শুনতে পেল সমুদ্রের প্রবল গর্জন।

কিন্তু একি! সমুদ্রে কি ঝড় উঠেছে? হয়তো তাই।

এই ঝড়ের মুখে বের হওয়া তা হলে তার উচিত হয়নি।

কিন্তু ওসব বিচার টারজান কোনদিন করে নি—করবেও না। বেরিয়ে যখন পড়েছে তখন আর সে ফিরে যাবে না।

প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েই সে নৌকা বেয়ে চলল। টারজান ভেবেছিল, রাত্রি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো সমুদ্রের এই মাতামাতি কমে যাবে। কিন্তু তা হল না।

ভোর হতেই সমুদ্রের মাতাল চেহারাটা চোখে পড়ল। বিরাট ঢেউ গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে। মহা আক্রোশে ভেঙে পড়ছে একটি ঢেউ আর একটি ঢেউয়ের ওপর। কি ভয়ঙ্কর সমুদ্রের চেহারা!

কিন্তু ভয় পাবার মানুষ টারজান নয়। সে এগিয়ে চলতে লাগল। বৈঠা চালাতে লাগল জোরে—আরও জোরে।

সমুদ্রটা তার ওপরেও ক্ষেপে উঠল বুঝি! ঢেউ ভেঙে ভেঙে তার নৌকার উপর পড়তে লাগল।

টারজান দেখল, এই অবস্থায় নৌকা চালিয়ে নেওয়া মুস্কিল। বৈঠা বেয়েও কোন সুবিধা হবে না। ঢেউয়ের হাত থেকে নৌকাকে রক্ষা করাই হল এখন সব চেয়ে বড় সমস্যা।

কিন্তু যে ভাবে ঢেউ উথলে উঠছে তাতে কি হবে কে জানে? টারজান বৈঠা চালানো বন্ধ করে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। নৌকার ভেতর জল সেচবার একটি সেঁউতি ছিল, তাই দিয়ে জল সেচতে লাগল।

তাতেও বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কি না কে জানে? যত জল সে সেচে ফেলে দেয়, আবার একটি ঢেউ-এ তার দ্বিগুণ জল নৌকায় ভরে ওঠে। কখনও নৌকাটি ঢেউয়ের উপর উঠে আবার হঠাৎ নীচের দিকে তলিয়ে যায়। আবার ঢেউয়ের মাথায় উঠে নৌকাটি দুলতে থাকে।

এ অবস্থায় কি করতে পারে টারজান? সাগর দোলায় দোল খাওয়া ছাড়া আর যেন কোন কাজ নেই।

এভাবে থাকতে কোন অসুবিধা ছিল না টারজানের। কিন্তু হঠাৎ উপস্থিত হল আর এক বিপদ। দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা জলজন্তু সাগরের ভিতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বিরাট একটা মাংসের পিণ্ড যেন ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠছে সাগরের ওপর।

ভয় না পেলেও টারজান বিপদের সংকেত যেন দেখতে পেল। বুঝতে পারল—এই বিরাট জন্তুর ধাক্কায় তার নৌকাটা যে কোন মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে।

জন্তুটার গতি যেন তারই দিকে। সেই গতিটাকে ফিরিয়ে দিতে না পারলে বিপদ হবে। কিংবা নিজের নৌকাটাকে নিয়ে যেতে হবে পেছনের দিকে বা অন্য কোন দিকে। কিন্তু তারই বা সুযোগ কোথায়?

বিশাল ঢেউ তাকে পাগল করে তুলেছে। নিজের খুশীমত কোন দিকে যাবার আর উপায় নেই।

টারজানের কাছে কোন অস্ত্র নেই ছোরা ছাড়া। সেই ছোরা নিয়েই টারজান এগিয়ে গেল। কিন্তু বুঝতে পারল এ দিয়ে কোন কাজই হবে না। তখন নিরুপায়

হয়ে বৈঠা নিয়ে জন্তুটার ওপর আঘাত হানতে লাগল। একবার নয়—দু'বার নয়—বার বার আঘাত।

কিন্তু তাতেও কোন ফল হল বলে টারজানের মনে হল না। জন্তুটা যেন তার দিকেই রুখে আসতে লাগল। দূরে শোনা যেতে লাগল একদল মানুষের মিলিত চীৎকার—হেই···হেই···হেই—

কাদের সেই চীৎকার টারজান জানে না। কোন্ দিক থেকে চীৎকারটা আসছে তাও বুঝবার উপায় নেই। টারজান নিজেকেই সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিরাট জন্তুটা প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা মারল নৌকার ওপর। নৌকাটা উল্‌টে গেল। টারজানও সেই সঙ্গে উল্‌টে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল। তারপর? (চলবে)

———

হাসতে মজা

এক মনভোলা ভদ্রলোকের কাছে এসে ট্রামের কন্‌ডাকটার টিকিট চাইলে। ভদ্রলোক কিছু পয়সা কন্‌ডাকটারের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—আমাকে একটা দিল্লী যাবার টিকিট দাও।

কন্‌ডাকটার বললো—আর পাঁচটা পয়সা দিন।

ভদ্রলোক তাই দিলেন। কন্‌ডাকটার হাওড়া স্টেশনের টিকিট কেটে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললো—এই নিন। ওখান থেকে দিল্লী যেতে খুব অসুবিধা হবে না। সোজা ট্রেনে চলে যেতে পারবেন।

ভিখারী বিদায়

ডাঃ বি, দে

আমি তখন দমদম-জংশন থেকে শিয়ালদার ডেলি প্যাসেনজার। তাড়াহুড়ো করে সাতটায় বের হয়েও আটটার সময়ে হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছানো একটা সমস্যা ছিল। হ্যারিসন রোড্ থেকে সর্টকাট করেই বেশীর ভাগ দিন যেতে হতো একদল ভিখারীর ভীড় ঠেলে—অত ভোর সকালেও। হাসপাতালে পৌঁছেই হাজিরা খাতায় নামটা দস্তখত করতে হয় সবাইকেই। আমি ওটাকে বলতাম 'জিন্দাখাতা', কেননা খাজাঞ্চীজী এই খাতা দেখেই মাসমাইনের বিল তৈরী করতেন কিনা! অতএব জিন্দা থাকা চাই।

ডাঃ বোরদে আর আমি প্রায় ভোরেই এক কামরায় আসতাম। তিনি ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশান থেকে আসতেন। বয়স্ক ভদ্রলোক চুপচাপ বসে ভোরের কাগজটা দেখতেন। কচ্চিৎ কারো সঙ্গে আলাপ করতেন। দেখলে মনে হতো ওঁর মনে যেন শান্তি নেই—যখন কাগজ থেকে মুখ ওঠাতেন—বাইরের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে যেন কি ভাবতেন।

ওর সঙ্গে কাজ করার বস্তুত অনেকদিন পরে, হাসপাতালেই একটি রোগী নিয়ে ডাক্তারদের আলোচনাকালে ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল। বুঝলাম রসজ্ঞান থাকলে কি হবে, মনে হলো উনি একটু রগচটা স্বভাবের।

এক রবিবার দুপুরে গাড়ীতে বাড়ি ফিরছি—অত্যন্ত ম্লানমুখে একটা প্যাকেট হাতে করে ডাক্তার আমার কামরায় এসে বসলেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝলাম একটা কিছু ঘটেছে। জিজ্ঞেস করলাম, "আজ এই ট্রেনেই যে ফিরে যাচ্ছেন? আপনি তো দুটোর ট্রেনেই যান।"

"আজ পুণ্য অর্জন করা ব্যর্থ হয়েছে তাই ফিরে যাচ্ছি।"

"ঠিক বুঝলাম না"—বললাম আমি।

"দেখুন আমার ডিউটি সাড়ে আটটা থেকে, তাই তাড়াহুড়ো না করে সদর রাস্তা দিয়েই হাসপাতালে যাই। কয়েকদিন হলো, একটি ভিখারী রাস্তার একটা গাড়া-

বরান্দার নীচে বসে ভিক্ষে করছিল। একেবারে কঙ্কালসার বুভুক্ষু চেহারা—অনবরত কাশছে আর চারদিকে থুথু কফ ফেলছে। কেউ দয়া করে কিছু দিলেই সে খেতে পারে। লোকটি এমন অসুস্থ যে তাকে দেখেই বোঝা যায় পয়সা এর কোন কাজে আসবে না। তাই ও পয়সা চায় না—খাবার ভিক্ষে চায়—যদি কেউ দয়া করে দেয়। একে কোনো হাসপাতালে যদি ভর্তি করা যেত, তবে আর কিছু না হোক রোগ বীজাণু মহল্লাতে এভাবে ছড়ানো হয়ত বা বন্ধ করা যেত। কিন্তু আমাদের হাসপাতালে ওকে ভর্তি করবে না জেনে—নানা জায়গায় যোগাযোগ করেও ব্যর্থ হলাম। ও লোকটার ওপর আমার কেমন যেন চোখ পড়ে গেছে। রোজই ভাবি একটা কিছু খাবার ওকে দিয়ে যাব। রুটি হলেই হবে, ভেবে পরেরদিন যখন রুটি কিনতে যাই, তখন ও ছেঁড়া চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে—আর পাশের রুটির দোকানটাও খোলেনি; ভাবলাম পরের দিন দেব।

পরের দিন ট্রেন হল লেট। শিয়ালদা থেকে বাধ্য হয়ে গলির রাস্তা ধরে সর্টকাট করলাম। আজ হঠাৎ সে ভিখারীর কথা মনে হলো। শিয়ালদা থেকেই একেবারে একখানা বন রুটি কিনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদের ভাব নিয়ে চললাম। কিন্তু রুটি আর দেওয়ার দরকার হলো না। ভিখারীর ভিক্ষে করার জীবন শেষ—করপোরেশনের গাড়ি মৃতদেহ নিয়ে যেতে এসেছে। জীবন্ত অবস্থায় যদি একখানা গাড়ী আসত—ভাবতেই আমার বিবেক আমাকে দংশন করল; আমি তো তাকে একটু খাবার দিতে পারতাম। তাই রুটিখানা বেঁধে এখন উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ করতে নিয়ে চলেছি। আমার এ চরম মুর্খতা,—অবহেলা জীবনে ভুলব না। একখানা রুটি দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে গিয়েছিলাম—। এ না করলেও চলতো।"

জংশন এসে গেলো—কিছু বলবার আর ফুরসৎ হলো না।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

আমার দেশ—আমার গর্ব

শ্রীধর মুনসি

এক

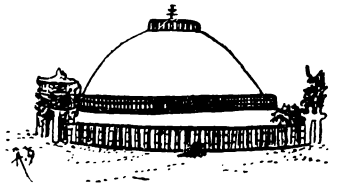

বোম্বে মেলে এলাহাবাদ হয়ে জব্বলপুর। সেখান থেকে ট্রেন বদলে আট ঘণ্টার পথ ভূপাল। ভূপাল থেকে বাসে তিন ঘণ্টার পথ সাঁচী।

সাঁচী একটি গ্রাম। থাকার জন্য টুরিস্ট বাংলো আছে, রেস্ট হাউস ও বৌদ্ধ আবাসিকা আছে। সাধারণের জন্য আবাসিকাই সবচেয়ে ভাল।

সাঁচীতে একটি ছোট পাহাড় আছে। উপরে উঠতে মিনিট পনেরো লাগে। উপরটা সমতল। উপরে তিনটি স্তূপ, একটি ভাঙা মন্দির ও একটি ভাঙা অশোক স্তম্ভ আছে।

একটি স্তূপ বড়। স্তূপটি গোলাকার। ব্যাস ১০৬ ফুট, উঁচু ৪১ ফুট। চারপাশে পাথরের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার মধ্যে প্রদক্ষিণ পথ। দু'টি পথ, একটি নীচে, একটি উপরে। নীচের পথ শেষ করে কয়েকটি সিঁড়ি উঠে উপরের পথে যেতে হয়।

প্রদক্ষিণ পথে প্রবেশ করার জন্য বেড়ার চারদিকে চারটি তোরণ আছে। উত্তর দিকের তোরণটিই সবচেয়ে বড়। ৬৫ ফুট উঁচু। পূর্ব তোরণটি ৩৩ ফুট। অন্য দু'টির উপরটা ভাঙা। তোরণের গায় নানা কারুকাজ আছে। দক্ষিণ তোরণে খোদাই করা আছে—অন্ধ্রদেশের নরপতি শতকর্ণী এই তোরণ তৈরী করিয়েছেন ১৫৫ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে একুশ শো বছর আগে।

স্তূপের মাথায় শ্বেত পাথরের তিনখানি চাকা আছে একটি দণ্ডের উপর। এই চক্র তিনটি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতীক।

অনেকের ধারণা বুদ্ধের চিতাভস্মের উপর আটটি স্থানে আটটি স্তূপ তৈরী করা হয়। সাঁচী তারই একটি।

সামনে একটি অশোক স্তম্ভ আছে। তিন টুকরোয় ভাঙা। তার গায় অশোকের অনুশাসন খোদাই করা আছে।

স্তূপের পিছনে কয়েকটি পাথরের থাম, এটা এক সময় চৈত্য-গৃহ ছিল। পাশে একটি ভাঙা মন্দির। মন্দির মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্তি আছে।

দ্বিতীয় ছোট স্তূপটি অশোকের সমকালের তিনজন বৌদ্ধ মহাভিক্ষুর চিতাভস্মের উপর তৈরী। তারা হিমালয়ের 'হিমবন্ত' প্রদেশে আশী হাজার অধিবাসীকে বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

তৃতীয় স্তূপটি বুদ্ধ-শিষ্য মোগগল্যায়ন ও সারিপুত্তের চিতাভস্মের ওপর তৈরী।

সামনেই একটি নতুন মন্দির হয়েছে। ১৯৫২ সালে এটি তৈরী শেষ হয়। গড়নটা সারনাথের মত। ভিতরে শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তি আছে।

সাঁচি স্তূপের বিশেষত্ব হলো ভারতের ভৌগোলিক মাপ-জোকের দিক থেকে। ভারতের দীর্ঘতম দ্রাঘিমা (longitude) ও অক্ষরেখার (latitude) সংযোগ বিন্দুতে এই স্তূপটি অবস্থিত। হাজার বছরেরও আগে থখন মানচিত্রের মাপজোকের এতো বিদ্যাবত্তা ছিল না বলে আমরা মনে করি তখন ভারতীয় স্থপতিরা এই দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার বিন্দু স্থির করে এই স্তূপ তৈরী করলেন কেমন করে ?—এ এক বিস্ময়। এবং এটাই আমাদের গর্ব।

দুই

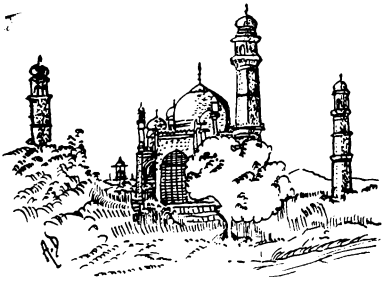

কলিকাতা থেকে বোম্বাইয়ের পথে জলগাঁও, সেখান থেকে বাসে যাওয়া যায় ঔরঙ্গাবাদ। আবার বোম্বাই থেকে ট্রেনেও আসা যায় ঔরঙ্গাবাদে। এক রাত্রির পথ।

ঔরঙ্গাবাদ একটি নগর। স্টেশনের কাছেই ধর্মশালা। নগরটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা। অধেকটা সমতল। কাছে সুর্পনথা নামে এক পাহার আছে, সেখানে নাকি রামায়ণের যুগে সূর্পনখা থাকতো।

দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের সময় ঔরংজীব এখানেই জীবনের শেষ কয়েক বছর কাটান। সেই থেকে এখানকার নাম হয় ঔরঙ্গাবাদ। এখানে ঔরংজীব ও তাঁর

বেগম রাসবাণু বেগম (রাবিয়া দুরাণী) মৃত্যু হয়। সম্রাটের সমাধি আছে কাছেই রৌজা গ্রামে। বেগমের সমাধি ঔরংগাবাদে। এই সমাধির নাম বিবি-কা-মকবরা। একটি ছোট তাজমহল।

মায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য সম্রাট পুত্র আজম শাহ এটি তৈরী করান। সাত বছর ধরে এটি তৈরী হয়েছিল। খরচ পড়েছিল ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ২০৩ টাকা।

যাঁরা তাজমহল তৈরী করেছিলেন বাদশাজাদা তাঁদের ডেকে পাঠান। অনেক শিল্পী তখন মারা গেছেন, তাঁদের বংশধররা এলেন। কথা হলো—আরেকটা তাজমহল তৈরী করতে হবে। শিল্পীরা মালমশলার হিসাব দিল। মালমশলা এলো। মিস্ত্রীরা অগ্রিম মজুরী নিয়ে কাজে হাত দিল।

কিন্তু কদিন পরে দেখা গেল মিস্ত্রীও নেই, মশলাপাতিও নেই। সব উধাও। কি হলো? খোঁজ খোঁজ। কিন্তু এতো বড় দেশে কে কাকে খুঁজে বের করবে?

দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন মিস্ত্রীরা ফিরে এসে কাজ সুরু করে দিল।

বাদশার হুকুমে সিপাইরা ধরে নিয়ে গেল মিস্ত্রীদের। বাদশা বললেন—কোথায় ছিলে? কাজ বন্ধ করেছিলে কেন?

শিল্পীরা বললো—কাজ বন্ধ রাখার দরকার ছিল। মালমশলা সব মাটির নীচে আছে। দীর্ঘকাল স্থায়ী কোন সৌধ তৈরী করতে হলে তার মালমশলা দশ বছর মাটির নীচে রেখে দেওয়া দরকার। গাঁথুনির বাঁধন শক্ত হয়।

মাটির নীচে সব মালমশলাই পাওয়া গেল।

কাজ সুরু হলো।

১৫০০ ফুট চওড়া এক চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে এটি তৈরী। চার কোণে চারটি ৭২ ফুট উঁচু মিনার আছে। তাজমহলের মত ফোয়ারা ও ফুলগাছ দিয়ে সাজানো। পাথরে সূক্ষ্ম কারুকাজ আছে। সাত বছর লেগেছে এটি তৈরী হতে। তবে তাজমহলের চেয়ে আকারে ছোট।

তিনশো বছরে এই সৌধের কোন ক্ষতি হয়নি। স্থাপত্যের এই নৈপুণ্য আজকের দিনে অজ্ঞাত। সে যুগের সেই শৈল্প-নৈপুণ্যই আমাদের গৌরব।

———

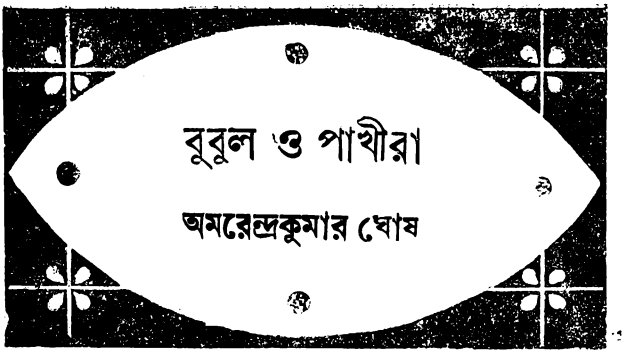

বুবুলদের আমড়াগাছে টুনটুনি আর বুলবুলির কথাবার্তা চলছে।

টুনটুনি বুলবুলিকে ডেকে বলতে লাগলো, জানিস বুলবুলি, আজ তোকে একটা মজার খবর দেবো।

টুনটুনির কথা শুনে বুলবুলি নাচতে নাচতে টুনটুনির কাছে এসে বললে, বল না ভাই কি মজার খবর ?

টুনটুনি বললে, এ-বাড়ীর ছেলে বুবুলের ভীষণ শরীর খারাপ করেছে। কয়েকদিন ধরে সে আর ঘরের বাইরে বেরোয় না। মশারির মধ্যে দিনরাত শুয়ে থাকে। ওর বসন্ত হয়েছে।

বুলবুলি বললে, তাই নাকি! তাহলে আমার খুব মজা। বেশ আনন্দে নাচ-গান করতে পারবো। ও সত্যি আমার পেছনে বড় লাগে। আমার গায়ে ঢিল ছোঁড়ে। কৌশলে দড়ির ফাঁদ পেতে তার সঙ্গে খাবার দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে ধরবার চেষ্টা করে। এবার আমি বেশ আনন্দে থাকতে পারবো।

টুনটুনি বললে, ভাই, আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। আমার গায়েও ঢিল ছুঁড়তো। আমি একবার আমড়াছের ডালে বাসা বেঁধেছিলুম। বুবুল বাঁশের খোঁচা মেরে আমার বাসা ভেঙে দিয়েছিল। তারপর আমি যখন গান গাই আমার সঙ্গে সঙ্গে ভেংচি কাটে।

ওরা কথা বলছে এমন সময় ওদের কাছে এসে বসলো কোকিল।

টুনটুনির কাছে বুবুলের অসুখের খবর পেয়ে কোকিলের খুব আনন্দ হলো। ও বললে, ভাল হয়েছে। ও আমাকে যা বিরক্ত করতো তা আর বলার কথা নয়। আমার গায়ে ঢিল ছুঁড়তো। আমার গানের সুর নকল করে আমাকে ভেংচি কাটতো।

সেই সময় কাক ওদিক দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ওদের কথা শুনে বললে, আমি কিন্তু বুবুলকে বেশী পাত্তা দিতুম না। মাঝে মাঝে ওর মাথায় আমার ঠোঁট দিয়ে ঠোক্কর দিতুম। তাতেই ও জব্দ হতো।

কাকের কথা শুনে টুনটুনি, বুলবুলি ও কোকিল বেশ আনন্দ পেল। ওরা এক সুরে বললে, আমরা তো ওকাজ করতে পারবো না। কারণ আমাদের শরীরে বল নেই।

কাক বললে, আমারও কি ছাই বল আছে। আমি চালাকির দ্বারা ওকে জব্দ করার চেষ্টা করি। তবু ওকে ভয়ও করি। কেননা, ওর একটা মারাত্মক ধরণের গুলতি আছে। তাই দিয়ে মাঝে মাঝে আমাকে আক্রমণ করে অবশ্য আমার গায়ে কখনো লাগে নি।

কোকিল বললে, যাক্, এই ক'দিন আমরা বেশ আনন্দে কাটাবো।

* * * * *

বেশ কয়েকদিন পরে বুবুল সুস্থ হয়ে উঠলো। এবার থেকে সে বাড়ীর ভেতরে ও বাইরে বেড়াতে লাগলো। তাকে দেখে টুনটুনি, বুলবুলি ও কোকিল ভয় পেয়ে গেল। উড়ে পালাতে চেষ্টা করলো।

বুবুল ওদের শান্ত হতে বলে বললে, আমি আজ থেকে আর তোমাদের ওপর কোনরকম অত্যাচার করবো না। তোমরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারো। তোমাদের যেমন মন চায় তেমনভাবে দিন কাটাতে পারো।

বুবুলের কথা শুনে টুনটুনির মনে খুব আনন্দ হলো। সে মুখ ঘুরিয়ে বুলবুলির দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসলো। কোকিলের মুখেও হাসি ফুটে উঠলো।

বুবুল একদিন পাখীদের উদ্দেশ্য করে বললে, আমি আর তোমাদের গায়ে ঢিল মারবো না। আমি তোমাদের এতদিন ধরে মেরেছি বলে ঠাকুর আমাকে এরকমভাবে বিছানায় শুইয়ে রেখেছিলেন। আমার শরীরে অসুখ দিয়েছিলেন। তাই এবার থেকে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনদিন তোমাদের ওপর কোনরকম অত্যাচার করবো না।

যেমন কথা তেমন কাজ করলে বুবুল। সত্যি তারপর থেকে সে টুনটুনি, বুলবুলি ও কোকিলের প্রতি কোনরকম অত্যাচার করলে না।

পাখীরাও বেশ আনন্দে খেলাধুলা, খাওয়া ও নাচ-গান করে বেড়াতে লাগলো। শত্রু তাদের হয়ে গেল বন্ধু।

———

জাতীয় খেলার কাঠামো

মুকুল দত্ত

কোচিনে জাতীয় ফুটবলের খেলা হয়ে গেল। মাদ্রাজে হয়ে গেল জাতীয় বাস্কেটবলের খেলা, গোরক্ষপুরে জাতীয় ব্যাডমিন্টনের। পুণাতে জাতীয় টেনিস, মাদ্রাজে জাতীয় টেবল টেনিস এবং বাঙ্গালোরে জাতীয় ভলিবলের খেলাও শেষ হয়েছে। জাতীয় ক্রিকেটের খেলা চলছে রাজ্যে রাজ্যে।

জাতীয় খেলা বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণভাবে জাতীয় খেলা বলতে আমরা সেই সব খেলাকে বুঝি যে সব খেলা আবহমান কাল থেকে আমাদের দেশে হয়ে আসছে। কিংবা আমাদের পূর্ব পুরুষরা যে সব খেলার প্রচলন করেছেন। যেমন কাবাডি, খো-কো, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়া বান্ধা, তীর-ধনুক ছোঁড়া প্রভৃতি। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, টেবল টেনিস, ভলিবল, বাস্কেট বল, ব্যাডমিন্টন সবই তো বিদেশী খেলা। বিদেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছে। তবু এ সব খেলার সঙ্গে আমরা জাতীয় কথাটি যোগ করি কেন কেন বলি জাতীয় ফুটবল, জাতীয় ক্রিকেট, জাতীয় হকি ইত্যাদি? না জাতি বলতে দেশকে অর্থাৎ ভারতকে বোঝায় এবং জাতীয় প্রতিযোগিতা বলতে বোঝায় ভারতীয় প্রতিযোগিতাকে।

যদি বলি ভারতে তো কত প্রতিযোগিতা আছে। ছোট মাঝারি প্রতিযোগিতার কথা ছেড়ে দিলেও এক ফুটবলেই আছে আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ, ডুরাণ্ড কাপ, ডি সি এম প্রভৃতি কত বড় প্রতিযোগিতা ক্রিকেটে আছে মইন-উ-দৌল্লা কাপের খেলা, দলীপ ট্রফির খেলা, ইরানী ট্রফির খেলা, ভিজি ট্রফি, কোচবিহার ট্রফি, সি কে নাইডু ট্রফির খেলা। হকির প্রতিযোগিতাই কি কম? নেহরুর নামে হকি প্রতিযোগিতা আছে, ধ্যানচাঁদের নামে হকি প্রতিযোগিতা আছে। আছে আগা খাঁর

নামে, বেটন সাহেবের নামে, আরও কতজনের নামে হকি প্রতিযোগিতা। এ সব প্রতিযোগিতা জাতীয় প্রতিযোগিতা হিসাবে চিহ্নিত নয় কেন? এই কারণেই চিহ্নিত নয় যে, সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে আয়োজিত যে কোন খেলার মাত্র একটি প্রতিযোগিতাই জাতীয় প্রতিযোগিতা হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। সব রাজ্যের সে প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার অধিকার থাকে। সে প্রতিযোগিতা জয়ের অর্থ দেশের শ্রেষ্ঠ দলের সম্মান লাভ। জাতির শ্রেষ্ঠ দল বা ঘুরিয়ে বলা হয় জাতীয় চ্যাম্পিয়ন।

তোমরা বোধহয় জান, সব খেলাধূলা পরিচালনার জন্য প্রতি রাজ্যে পৃথক পৃথক সংস্থা আছে। যেমন আমাদের বাংলায় আছে ফুটবলের জন্য আই এফ এ (ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশান), ক্রিকেটের সি এ বি (ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান অফ বেঙ্গল), হকির জন্য বি এই এ (বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশান)। অন্যান্য খেলারও অ্যাসোসিয়েশান আছে। এখানকার বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিয়েই এই সব অ্যাসোসিয়েশান গড়ে উঠেছে। আবার এই সব অ্যাসোসিয়েশানের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে উঠেছে সর্ব-ভারতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ। যেমন অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন, ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশন, ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি। এই সব ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে আবার গড়ে উঠেছে বিশ্ব ক্রীড়াসঙ্ঘ।

সে কথা যাক। রাজ্যের ক্রীড়া সংস্থাগুলি রাজ্যের খেলাধূলার ব্যবস্থা করে থাকে। জাতীয় খেলাধূলারও ব্যবস্থা করে থাকে যখন সর্ব-ভারতীয় ক্রীড়াসঙ্ঘ সে ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত করে রাজ্যের উপর। সাধারণত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক এক রাজ্যে এক এক বছর জাতীয় খেলার আসর পাতা হয়। যেমন এবার জাতীয় ফুটবলের আসর বসেছিল কোচিনে। তার আগের বছর গোয়াতে সর্ব-ভারতীয় সংস্থাই ঠিক করে দেয় কোন্ বছর কোথায় জাতীয় আসর বসবে।

আগেই বলেছি, জাতীয় প্রতিযোগিতায় সব রাজ্যেরই যোগ দেবার অধিকার থাকে। রাজ্য ছাড়া আরও দু'টি সংস্থা জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার অধিকার পেয়েছে। এই দু'টি সংস্থা হচ্ছে রেলওয়েজ ও সারভিসেস। অর্থাৎ সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে রেল কর্মীদের ও সামরিক বিভাগের লোকদের নিয়ে গড়া দলও জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার অধিকারী।

রেলওয়েজ, সারভিসেস ও সমস্ত রাজ্য দল ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ভলিবল,

বাস্কেট বল প্রভৃতির জাতীয় আসরে পরস্পর প্রভিযোগিতা করে। নাম জাতীয় প্রতিযোগিতা। কিন্তু টেবল টেনিস যা ব্যাডমিণ্টনে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের এই পারস্পরিব প্রতিযোগিতার নাম কিন্তু আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা। ওখানে ব্যক্তিগতভাবে খেলোয়াড়দের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার নাম জাতীয় প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ীর জাতীয় চ্যাম্পিয়নের সম্মান। টেনিসে কিন্তু আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই।

কাকে জাতীয় খেলা বা প্রতিযোগিতা বলে, কী ভাবে তা পরিচালিত হয়, তার কাঠামো কি ধরণের—এ সবের একটা আভাষ দেবার জন্যই এত কথা লিখতে হল।

তোমরা বোধহয় জান জাতীয় ফুটবলের আর এক নাম সন্তোষ ট্রফির খেলা। কেন এই নাম? তোমরা বলবে বিজয়ীর পুরস্কার সন্তোষ ট্রফি বলেই ওই নাম। সত্যি কথা। কিন্তু অনেকেই বোধহয় জাননা, ময়মনসিংহ জেলার (এখন বাংলা-দেশের জেলা) সন্তোষের মহারাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, যিনি আই এফ-এর সভাপতি ছিলেন ট্রফিটি তাঁরই দান এবং তার ইচ্ছায় সন্তোষ ট্রফি নাম। ট্রফিটির উপর পরলোকগত মহারাজার ছবি মীনে করা আছে।

ভারতের 'অমর' ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজী—যাঁর কথা আগে লিখেছি—তাঁর নামানুসারে জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার নাম রণজি ট্রফির খেলা। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কারের নাম কি বলত? জেনে রেখো। পরে আ মও জানিয়ে দেব।

———

নূতন ধাঁধা

১। তিন অক্ষরে আজব পাখী
দেখা এখন পাওয়াই ভার ;
লেজ কাটলে চারপেয়ে এক
জন্তু হবে চমৎকার।
পেট কাটলে দেখতে পাবে
সৈন্যদলের বাসস্থান,
বল দেখি বুদ্ধি করে,
আজব পাখীর কি সে নাম ?

২। শ্বেত পাথরে তৈরী যেন ধবধবে সে পুরী,
সাদা বরণ সাদা গড়ন নেইক কারিকুরি।
দরজা নেই, জানালা নেই, ফাঁক নেই কোথায়,
কেমন করে বাঁচে প্রাণী—ভাবা বিষম দায়।
অবাক ভারী, দু'দিন পরে প্রাসাদখানি টুটে,
জ্যান্ত হয়ে বন্দী প্রাণী বাইরে পালায় ছুটে।

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর

১ম ধাঁধার উত্তর—১ম ঝুড়িতে ৪২, ২য় ঝুড়িতে ৫৫, ৩য় ঝুড়িতে ৪৮, মোট আম ১৫৪টি।

২য় ধাঁধার উত্তর—১ম পংক্তি ৭৮৯, ২য় পংক্তি ৯৮৭।

অগ্রহায়ণ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম

কলিকাতা : রামু, মাসু, নন্দিতা, অসিত, বাসু।

হাওড়া : হাবু, কাবু, সবিতা।

হুগলী : লক্ষ্মী, ভোলা, ছন্দা, তন্দা।

২৪ পরগণা : অরুপ, বিশাল, শ্যামল।

বর্দ্ধমান : মাণিক, রুপম, রেণুকা, রেবতী।

ত্রিপুরা : বুবাই, সবিতা, অনামিকা।

আমাদের প্রকাশিত

ঃ ১৯৭৪ সালের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা ঃ

* সাহিত্য পাঠ (৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য)
—ধীরেন্দ্রলাল ধর

* বিজ্ঞান-প্রবেশ (নবম শ্রেণীর পাঠ্য)
(ভৌত বিজ্ঞান)
—অধ্যাপক সি. আর. বাসু
ও কে. বি. পাল

Beginners' English Grammar
Translation and Composition
(For Class V & VI)
—H. KUNDU

সংস্কৃত মঞ্জরী (অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য)
—শ্রীশ্যাম বিনোদ শীল

নূতন পাটীগণিত (৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য)
—শ্রীসুভাষ চন্দ্র হালদার

সরকার প্রকাশন

বি-৭, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক নব-প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবর্ষে অবশ্য অপরিবর্তনীয়।

Cover printed by Kartick Art Press, Cal-12.